ভাগ্যকে আমি সৌভাগ্য বলেই গণ্য করি। মানুষ যে জীবনে এর চেয়ে বড় কিছু পেতে পারে বা বড় কিছু দিতে পারে তা আমার জানা নেই। টাকাকড়ি ধনদৌলত দেওয়া সোজা কিন্তু বড় শক্ত কথা হচ্ছে এই বিচারবিহীন ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। এটি তাঁর সাধারণ লোকের মত চোখের নেশা ছিল না—এটি ছিল তাঁর

কবিহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় একটি নীরব সাধনা। এই সাধনার নিষ্পাপ জ্যোতির্লেখায় তাঁর সমস্ত সত্তাকে আমি অর্চ্চিত হতে দেখেছি। তাঁর সমস্ত কাব্য-প্রতিভার মূল উৎস ছিল এইখানে। এইখানকার সুখ-দুঃখের লীলায় তাঁর জীবন-বীণায় আশানিরাশার বাণী ধ্বনিত হয়েছে। জীবনের এই পর্ব্বের অনেক ছোট খাট খুঁটিনাটি কথা আমাকে বল্‌বেন বলে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন কিন্তু কোন বারই তা আমার শোনা হয় নি, অন্য বিষয় নিয়ে কথা কয়েই আমাদের রাত ভোর হয়ে যেত। কিন্তু যদিও এই খুঁটিনাটির ইতিহাস আমার অজানা রয়ে গেছে তবুও আজ তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। যেটা জানলে এই সব খুঁটিনাটি জানার দরকার হয় না সেইটে অনুভব করতে পারায় আমি বঞ্চিত হয়েছি এ মনে করতে পারি না। তাঁর কাব্যের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, "তোমার জন্যে কি করেছি এটা বড় কথা নয় কিন্তু আমি ভাবি তোমার জন্যে আরও কি না করতে পারতুম।" প্রেমের রাজ্যে এর চেয়ে বড় কথা আমার জানা নেই।

আমি তাই অনেক সময় আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি যে, যে সকল লোকের মধ্যে আমরা চলাফেরা করি তারা কি ভুল ভাবেই না মানুষের বিচার করে! হরিসাধনবাবুর সমস্ত জীবনের মধ্যে যেটা মানবত্বের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ, সেটাকে কেউ প্রশংসার চোখে ত দেখেই নি, বরঞ্চ বিকৃত ক'রে দেখেছে। কিন্তু মানব-হৃদয়ের যে দুর্দ্দমনীয় প্রবণতা তাকে তার গৃহস্থালী আত্মীয়-স্বজন, উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা, জরা-ব্যাধি ভালমন্দ সব থেকে মুক্ত ক'রে তাকে একটি একাগ্র নীরব সাধনার পথে অগ্রসর করায়—এ যদি ভগবানের ডান হাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান না হয়, তবে রূপ ঐশ্বর্য্য বিদ্যা তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এ কথা আমি কোন মতেই স্বীকার করতে পারব না।

আজ এই বাৎসরিক স্মৃতিসভায় আমরা তাঁর হৃদয়ের এই অমোঘ শক্তিকে অর্চ্চনা করি। তিনি বলেছিলেন, "বস্তুকে যারা জীবনের সার বলে জেনেছে মৃত্যু তাদের—রসের মধ্যে যারা বিশ্বকে পেয়েছে তারাই পেয়েছে আনন্দ, তারাই পেয়েছে অমৃত।"—তাঁর এই বাণীকে আজ আমরা স্মরণ করি—আমরা উপলব্ধি করতে প্রয়াস পাই।

পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

ভারতের বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খোরাসানের অধিপতি সঞ্জর স্বীয় রাজধানীকে বিদ্বৎমণ্ডলীতে পরিশোভিত করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা কাব্য-মধুপ সেখানে গিয়া বিচিত্র মধুচক্র রচনা করিয়া ছিলেন। ইঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন কবি মুয়িজ্জী। মুয়িজ্জীর নিকট ছাড়পত্র না পাইলে কোনও নব-সাহিত্যিক সম্রাট সঞ্জরের রত্নসভায় প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। সঞ্জরের আদেশ ছিল, নব্য-কবিরা প্রথমে মুয়িজ্জীর নিকট তাহাদের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবে। মুয়িজ্জী যেগুলিকে নির্ব্বাচন করিবেন, সেইগুলিই শুধু সঞ্জরের নিকট পঠিত হইবে।

মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তি এমনই প্রখর ছিল যে, তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার একপুত্র ছিল, তিনি দুইবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আর ইঁহাদের একটি ভৃত্য ছিল, সেও like master like servant—তিনবার যাহা শ্রবণ করিত, তাহা অবিকল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিত ;

জগতে আত্মপ্রীতি ও পরশ্রীকাতরতা কাহার না আছে ? কবি মুয়িজ্জীও ইচ্ছা করিতেন না যে, অপর কেহ উৎকৃষ্ট কবিতা দ্বারা সঞ্জরকে মোহিত করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইবে। তিনি প্রতিভান্বিত কবি দেখিলেই তাঁহার কবিতা নিজ পুত্র ও ভৃত্যের সম্মুখে মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিতেন, এ তো আমার লেখা কবিতা! এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। যতবড় কবিতাই হউক মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তি জীবনে কখনও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ করে নাই! শুধু নিজে আবৃত্তি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, নিজের আবৃত্তি শেষ হইলে বলিতেন, দেখুন, এ যে আমার কবিতা এর প্রমাণ আমার পুত্রেরও ইহা মুখস্থ আছে। এই বলিয়া স্বীয় পুত্রকে উহা আবৃত্তি করিতে বলিতেন। বাপ্ কা বেটা—সেও অনর্গল উহা আওড়াইয়া যাইত, কেননা ইতিমধ্যেই তাহার উহা দুইবার শোনা হইয়া গিয়াছে পুত্রের আবৃত্তি শেষ হইলে মুয়িজ্জী স্বীয় ভৃত্যকে উহা আবৃত্তি করিতে বলিতেন। সেও তোতা পাখীটির মত উহা ললিতস্বরে গাহিয়া যাইত। কেননা তাহারও ইতিমধ্যেই ঐ কবিতা তিনবার শোনা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থ লোকেরা তখন আর মুয়িজ্জীকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ফলে নব্য প্রবেশার্থী মুয়িজ্জীর নিকট হইতেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

সভাসদেরা মুয়িজ্জীর চতুরতা না বুঝিলেও যাহারা প্রতারিত হইত, তাহারা তো নিজ অন্তরে অন্তরে জানিত যে মুয়িজ্জীর ইহা প্রতারণা! তাহারা রাজসভায় প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইলেও স্বদেশে গিয়া এই অদ্ভুত লোকটির প্রতিভা ও চতুরতার কথা প্রচার করিত।

যুবক-কবি আনোয়ারী ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। একদিন এক রাজকবিকে মহাড়ম্বরে হস্তী আরোহণে বেড়াইতে দেখিয়া আনোয়ারীর ধারণা হইল, ধনৈশ্বর্য্য ও ললিতকলার ভিতর যে চিরন্তন বিরোধ, উহা মিথ্যা কথা। তিনি সেই দিনই রাত্রিতে বীজগণিত, জ্যামিতি আর খগোলশাস্ত্র যা-কিছু ছিল, সমস্তই সযত্নে বাক্সে পুরিয়া কবিতা-চর্চ্চায় লাগিয়া গেলেন এবং লিখিলেন—

গার্ দেল্ ও দাস্ত্ বাহার ও কান্ বাশাদ।
দেল্ ও দাস্তে খোদায়গান্ বাশাদ॥
খোশ্রু বান্দা রা চু দহ্ সাল্ আস্ত।
কাশ্ হামী আরযুয়ে আঁ বাশাদ॥
কায্ নদীমানে ময্লেস্ আর না বুয়াদ।
আয্ মকীমাদে আস্তান বাশাদ॥

আনোয়ারী রা খোদায়-গানে জাহান্‌।
পেশে খোদ্‌ খান্দ ও দস্ত দাদ ও নেশান্দ॥

অনুবাদ—

হৃদয় কাহার সাগরপারা হস্ত রতনখানি—
তোমায় শুধু সম্ভবে তা ওগো মানবমণি!
দশটি বরষ এই আশাতে ওগো শাহান্‌ শাহ্‌,
বান্দা তোমার জীবন যাপে, আজকে বলি তা।
তোমার রতন-সভার মাঝে বসতে যদি নারি—
দ্বারে তোমার ধুলোয় মাথা রাখতে যেন পারি,
আজকে আমার পূর্ণ আশা ওগো জাহানপতি,
ডাক পড়েছে তোমার সভায় গেতে বন্দ-গীতি!

কবিতা লিখিয়া আনোরী আশায় বুক বাঁধিয়া খোরাসানে চলিলেন। সেখানে সঞ্জরের বিশ্ববিশ্রুত রত্ন-সভা। কিন্তু পরে মুয়িজ্জীর কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া আনোয়ারী যারপরনাই চিন্তিত হইলেন! পরিশেষে এক কৌশল মনে মনে স্থির করিলেন। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ', আনোয়ারী ছিন্নবাস পরিধান করিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে মুয়িজ্জীর সমীপে উপনীত হইয়া এক বিচিত্র ঢংএর পাঁচালী গাহিলেন, মুয়িজ্জী দেখিলেন, এ একটা মস্ত ভাঁড়। বলিলেন, তুমি কি চাও? আনোয়ারী কহিলেন, হুজুরের মর্জ্জি হইলে শাহান্‌শাহ্‌ সম্রাটকে একটা ছড়া শুনাইয়া এ বান্দা নসিব বলন্দ করিত।

মুয়িজ্জী দেখিলেন, ইহাতে কোনও আপত্তির কারণ নাই। তিনি আনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া সঞ্জরের সভায় লইয়া গেলেন। মুয়িজ্জীর বিশ্বাস ছিল—এ বেটার ভাঁড়ামীতে আজ রাজসভায় বেশ একটা রগড় হইবে। সভায় প্রবেশ করিয়া সঞ্জরের প্রবেশের পুর্ব্বেই আনোয়ারী পূর্ব্ববেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মনোহর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইলেন। তারপর সম্রাট সমীপে আহূত হইলে তাঁহার কবিতার প্রথম পদ আবৃত্তি করিয়াই মুয়িজ্জীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, হুজুরের যদি এ কবিতা জানা থাকে, তবে আমি আর এ কবিতার বাকীটুকু বলিতে চাই না, হুজুরের মধুর কণ্ঠেই সেটুকু ভাল শুনাইবে। শাহান্‌ শাহ্‌ও খুশী হইবেন।

মুয়িজ্জী শ্রুতিধর হইলেও অশ্রুত জিনিষ তো আর আবৃত্তি করিতে পারেন না। তিনি বুঝিলেন, এবার তিনি সহজ পাল্লায় পড়েন নাই। সঞ্জর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই মুয়িজ্জী বিব্রত হইয়া বলিলেন, না খোদাবন্দ, এ কবিতা আমার জানা নাই।

তখন আনোয়ারী তাঁহার কবিতার বাকী অংশ পাঠ করিলেন। সঞ্জর তাঁহার কবিতায় এমনই আকৃষ্ট হইলেন যে, অগণিত মণিমুক্তায় তাঁহার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং রাজসভায় তাঁহার জন্য সর্ব্বোচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মুয়িজ্জী ম্লানমুখে আনোয়ারীর কবি-প্রতিভার বন্দনা করিয়া নিম্নতর আসন গ্রহণ করিলেন। ঈর্ষা দূরে মনে মনে হাসিল।

—সওগাত

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

ষষ্ঠ অধিবেশন

মীরাট

অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটিতে মীরাটে হইবে স্থির হইয়াছে। এই সম্মিলন বাঙালী মাত্রেরই গৌরব এবং আদরের সামগ্রী। ইহা আমাদের জাতীয় একতা এবং বন্ধুত্বের প্রতীকস্বরূপ। এই অনুষ্ঠানের সাফল্য বিদ্বজ্জনের সমবেত চেষ্টা এবং উৎসাহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আমাদের ভাই এবং বন্ধুগণ সদলে এই সাধু অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুলুন এই প্রার্থনা করি।

৺দুর্গাবাড়ী
সদর বাজার
মীরাট ছাউনি
২১শে আষাঢ়, ১৩৩৪

শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বাস
কার্য্যাধ্যক্ষ

অসংলগ্ন

শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র

লেখ্‌বার আর নতুন কিছু নেই।

পরম বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উপলব্ধি করি—আন্‌কোরা কলমে নতুন কালিতে কুমারীর মত নিষ্কলঙ্ক শুভ্র খাতার পাতায় সদ্যোজাত যে কল্পনাকেই লাইন থেকে লাইনে টেনে নিয়ে চলি না কেন, তাও রামায়ণের মহাকবির প্রথম শ্লোকের মতই পুরোনো।

যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু বৃহৎ, যা কিছু সুন্দর, লেখনীকে যা-কিছু ধন্য করে সবই পুরোনো—পুরোনো নারীর রূপ, পুরোনো পুরুষের প্রেম, পুরোনো পৃথিবীর বৈচিত্র্য, পুরোনো মানুষের অনির্ব্বাণ নূতনের জন্যে ব্যাকুলতা।…

তাই সত্যি নতুন লেখকের কথা শুনলে ভয় হয়। পৃথিবীর চির-রহস্যময় চির-সরস পুরাতনত্ব পরিত্যাগ ক'রে তারা কী নতুন উন্মত্ততার নীরসতায় মেতেছে? নতুন লেখকের লেখাও বুঝি নতুন, এই ভেবে ভয় হয়। ভয় হয় তারা বুঝি গল্পের পর গল্পে, সকল গুণের আধার, নর ও নারী চরিত্রের আদর্শ, নায়ক-নায়িকার বিবাহ ও তারপর অনন্ত সুখমিলনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বুঝি তারা সাধু ও শয়তানের অন্যায় দ্বন্দ্বে অসমকক্ষ বেচারী শয়তানের অসীম লাঞ্ছনার আয়োজন কর্‌ছে, বুঝি তারা মানুষের স্বাভাবিক সরলতা, নারীর সহজ প্রেমের নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত মহত্ত্বকে একঘেয়ে চাটুবাদের কালিতে জঘণ্যতম পাপের চেয়েও বিস্বাদ ক'রে তুল্‌ছে।

শঙ্কিত হয়ে নতুন লেখকদের লেখা পড়ি। প'ড়ে আশ্বস্ত হই,—লেখা তাদের পুরাতন, শক্তিমান হয় ত নয়; কিন্তু রামায়ণের মত পুরাতন, মহাভারতের মত পুরাতন, কালিদাসের মত পুরাতন, বৈষ্ণব কবিদের মত পুরাতন, ভারতচন্দ্রের মত পুরাতন, সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মত পুরাতন।

নতুন শুধু সমালোচকেরা। তারা নতুন কলম জোর ক'রে বাগিয়ে ধ'রে কালি ছিটোয়—

আর পূর্ব্বের তিমিরালিপ্ত দিগন্তে সেই পুরাতন অরুণোদয় ঘটে।

বীজের শৃঙ্খল ফেলে অঙ্কুর উদ্গমের সেই পুরাতন উৎসব চলে দিকে দিকে।

*   *

*

নতুন লেখকেরা নাকি অশ্লীল।

পৃথিবীতে বুদ্ধ খৃষ্ট ও চৈতন্যেরা গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে রাস্তায় চলে এ কথা তারা না হয় নাই মান্‌ল, মিথ্যা ও পাপকে ধামাচাপা দিলে যে মারা যায় এ কথাও নাকি তারা মানে না!

তাদের পটে নাকি সাধুর মস্তক ঘিরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখা যায় না, পাষণ্ডকেও নাকি সে পটে মানুষ বলে ভ্রম হয়! ন্যায়ের অমোঘদণ্ড নাকি সেখানে আগাগোড়া সমস্ত পরিচ্ছেদ সন্ধান ক'রে শেষ পরিচ্ছেদে অভ্রান্ত ভাবে পাপীর মস্তকে পতিত হয় না!

বঙ্কিমচন্দ্রের মত শৈবলিনীর ভালবাসারূপ ক্ষমাহীন পদস্খলনের অমানুষিক শাস্তি না দিয়ে, 'নৌকাডুবি'র লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কমলাকে রমেশের প্রতি স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত্ত প্রেম থেকে অর্থহীন কারণে বিচ্ছিন্ন ক'রে অপরিচিত স্বামীর উদ্দেশে অসম্ভব অভিসারে

প্রেরণ না ক'রে, 'পথ-নির্দ্দেশ'-এর রচয়িতা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি মিলন-ব্যাকুল পরস্পরের সান্নিধ্যে সার্থক হৃদয়কে অপরূপ যথেচ্ছ পথ-নির্দ্দেশ না ক'রে তারা নাকি ঋষি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিখিলেশের বিমলাকে আত্মোপলব্ধির স্বাধীনতা দেওয়ার পরম অশ্লীলতাকে সমর্থন করে, সত্যদ্রষ্টা নির্ভীক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অভয়ার জ্যোতির্ম্ময় নারীত্বকে নমস্কার করে !

সব চেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানে না। মুটে মজুর কুলি খালাসী, দারিদ্র্য, বস্তি ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দ্দি, বাত, স্থূলতা ইত্যাদির মত অনাবশ্যক অথচ আপাতত অপরিহার্য্য বলে জীবনেই কোন রকমে ক্ষমা করা যায় – এবং বড় জোর কবিতায় একবার—'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু' ইত্যাদি বলে আল্‌গোছে হা-হুতাশ ক'রে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের স্বপ্নবিলাসের মধ্যে সে সবও নাকি টেনে আনতে চায় !

শুধু তাই ! বস্তির অন্তরের জীবনধারাকে তারা প্রায় 'গ্যারেজ'-ওয়ালা প্রাসাদের অন্তরালের জীবনধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে ! এমন কি তারা মানে যে, প্র সাদপুষ্ট জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য সময়ে সময়ে বস্তির জীবনকে ধরি-ধরিও করে !

তারা নাকি আবিষ্কার করেছে—পাপী পাপ করে না, পাপ করে মানুষ, বা আরো স্পষ্ট ক'রে বল্লে মানুষের সামান্য ভগ্নাংশ ; মানুষের মনুষ্যত্ব ছনিয়ার সমস্ত পাপের পাওনা অনায়াসে চুকিয়েও দেউলে হয় না।

এ আবিষ্কারের দায়িত্বটুকু পর্য্যন্ত নিজেদের ঘাড়ে না নিয়ে তারা নাকি ব'লে বেড়ায়—বুদ্ধ খৃষ্ট শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে তারা এগুলি বেমালুম চুরি করেছে মাত্র।

মানুষের একটা দেহ আছে এই অশ্লীল কিংবদন্তীতে তারা নাকি বিশ্বাস করে এবং তাদের নাকি ধারণা যে, এই পরম রহস্যময় অপরূপ দেহে অশ্লীল যদি কিছু থাকে ত সে তাকে অতিরিক্ত আবরণে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার প্রবৃত্তি।

—ইতি।

কিন্তু অভিজাত, নিষ্কর্ম্মা, মানবহিতৈষী সমাজরক্ষক আর্টত্রাতারা থাকতে ইতি হবার জো নেই।

তাই বলছি জার্ম্মেনীতে 'ম্যাড এ্যাণ্ড ট্র্যাস্ বিল্' পাশ হয়েছে যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষা ফেরত উন্মিলিতদৃষ্টি তরুণ লেখকদের অশ্লীল সাহিত্যকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে, ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা আত্মার শুচিতা রক্ষার্থে কি পাঠ্য আর কি অপাঠ্য তার তালিকা ক'রে মাসে মাসে শিষ্যসেবায়েৎদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছেন।

এখানে সেই রকম কিছু একটা সৎপ্রচেষ্টা স্বরু করলেই হয়।

এই সুস্থ সবল শিল্পপ্রাণ নীতিবলে বলীয়ান মানবজাতির স্বনিযুক্ত ত্রাতা ও সেচ্ছাসেবকদের সাধু ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে আমাদের অত্যন্ত আস্থা আছে।

মানুষের এই সামান্য তিন চার হাজার বছরের ইতিহাসেই তাঁদের হিতৈষী হাতের চিহ্ন বহু জায়গায় সুস্পষ্ট।

'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' ছুটি ক্ষীণপ্রাণ কাগজের কণ্ঠদলন ত সামান্য কথা। কালে হয় ত তারা পৃথিবীর সমস্ত বিদ্রোহী ও বেসুরো কণ্ঠকেই একেবারে স্তব্ধ ক'রে ধরণীকে শ্লীলতা ও ভব্যতার এমন স্বর্গ ক'রে তুলতে পারেন যে, অতিবড় নিন্দুকেরও প্রমাণ কর্‌তে সাধ্য হবে না, রামের জ্যামিতিক জীবন থেকে শ্যামের জ্যামিতিক জীবন বিন্দুমাত্র তফাৎ ; এবং মাতা ধরিত্রী এতগুলি ছাঁচে-কাটা সুসন্তান ধারণ করবার পরম আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে সূর্য্যের অগ্নিজঠরে পুনঃপ্রবেশ ক'রে আত্মহত্যা কর্‌তে চাইবেন। এতদূর বিশ্বাসও আমাদের আছে।

তবে মানুষ আসলে সমস্ত শ্লীলতার চেয়ে পবিত্র ও সমস্ত ভব্যতার চেয়ে মহৎ—এই যা ভরসা।

*

* *

বাঙালীর চিরকেলে অপবাদ—সে নিষ্ক্রীয়।

এ অপবাদ ঘোচাবার জন্যে অনেকেই বহুকাল হতে উঠে পড়ে লেগেছেন কিন্তু হাতে পায়ের চেয়ে কাগজে কলমেই বেশী।

ক্রিয়া কর্ম্ম তার এককালে হয় ত খুব ছিল কিন্তু ভাষার ক্রিয়ায় তার চিরকেলে অনটন। তাই কলমও তার তেমন জোর ক'রে চলে না বহুদূর।

বাঙলা ভাষা পঞ্চাশ বছরে অসাধ্য সাধন করেছে মানি; কিন্তু যথেষ্ট ক্রিয়ার অভাবে তাকে যে পদে পদে কৃত্-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের চৌকাটে হোঁচট খেতে হয়েছে এ কথাও না মেনে উপায় নেই।

চলতি বাঙলাকে জাতে তোলবার আগে ত তার দুরবস্থার সীমা ছিল না। কথায় কথায় কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারস্থ না হলে তার কিছু করবার উপায়ই ছিল না। এখন তবু সোজাসুজি সে খায় বেড়ায় নাচে হাসে, তখন আহার ক'রে, ভ্রমণ ক'রে, নৃত্য ক'রে ও হাস্য ক'রে ক'রে, করার এক-ঘেয়েমিতে তার প্রাণান্ত হয়েছে। একমাত্র ভরসা ছিল ওই কৃ ধাতু—তার সাহায্যে সে কোন রকমে জীবন ধারণ করেছে, কিন্তু বাঁচে নি।

কিন্তু চলতি বাঙলাকে জাতে তুলেও তার ক্রিয়ার দৈন্য ঘোচে নি। এখনও যখন তখন কৃ ধাতুর ডাক পড়ে, বিশেষত নতুন কিছু করতে হলে ত বটেই। বাঙলাদেশের জল হাওয়ার গুণেই হোক বা যে কারণেই হোক, কর্ম্মে অনাসক্তি এ দেশের ভাষাকেও পেয়ে বসেছে। এ দেশের বিশেষ্যগুলি পর্য্যন্ত কৃৎপ্রত্যয়ের আসন ক'রে সকল প্রকার কর্ম্মে অনাসক্ত হয়ে দিব্য নিশ্চল হয়ে বসে থাকে।

কোন দেশেই ক্রিয়া আপনা থেকে সহজে জন্মায় না, অন্য কিছু থেকে তার রূপান্তর হয় ক্রিয়ায়। কিন্তু কেউ ক্রিয়া হতে চায় না। অন্য দেশের 'nest' অতি সহজে গাছের কোলে 'nestle' করে এবং 'motor' জন্মাতে না জন্মাতেই সবেগে ক্রিয়াপদে অভিষিক্ত হয়। পরম সম্ভ্রান্ত 'lord' পর্য্যন্ত সেখানে ক্রিয়ার কাজ করা অপমান মনে করেন না। কিন্তু এখানে স্বয়ং কৃপাকেও ক্রিয়ার প্রতি কৃপা করতে বলা মূর্খতা।

বহুদূরদর্শী মাইকেল বহু আগেই এ সমস্যা বুঝে সবলে বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় নামিয়ে ভাষার এ জড়ত্ব দূর করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক দেশ তাঁর সে চেষ্টায় হেসেছিলেন মাত্র।

তাঁর সে চেষ্টা ভেসে গেছে, সে চেষ্টার ত্রুটিও হয় ত কিছু ছিল। বাঙলার ক্রিয়ার সুরাহা কিন্তু আজো হয় নি।

ক্রিয়া ভাষার চাকা—সে গতি। তার প্রাচুর্য্য না হলে ভাষার বেগ হয় না।

বাঙলাকে আরো ভাল ক'রে চালাবার জন্যে ক্রিয়ার সমস্যার মীমাংসা একান্ত প্রয়োজন।

এইচ্ জি, ওয়েল্‌স্ আজকাল শিক্ষিত জনসমাজে সুপরিচিত। ইনি পৃথিবীর ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া গণ্য। ইঁহার রচিত পুস্তকাদি বহুসংখ্যক। যাঁহারা বর্ত্তমান কালের চিন্তাধারার সহিত যোগরক্ষা করিতেছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ওয়েল্‌স্-এর উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, ওয়েল্‌স্-এর উপন্যাস পাঠ করিয়া উপন্যাসের মত মনে হয় না। তাহার হয় ত একটা কারণ আছে। ওয়েল্‌স্ তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পুস্তকেই দুই একটি করিয়া এমন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এ যুগের মানুষের কাছে ঐ চরিত্রগুলি সুপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। মানুষ কি হইতে পারে, তাহারই সম্ভাবনাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ওয়েল্‌স্ এই চরিত্র-গুলি কল্পনা করিয়াছেন। ওয়েল্‌স্ এই অনাগত মনুষ্য সমাজ ও এক উদার আদর্শে প্রবুদ্ধ নূতন পৃথিবীকে কামনা করেন। ওয়েল্‌স্-এর পুস্তকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্ব্বে কল্লোল হইতে ওয়েল্‌স্‌কে পত্র লেখা হয়। তাহার উত্তরে ওয়েল্‌স্ যে লিপিখানি ও ছবি পাঠাইয়াছিলেন তাহা ভাদ্র সংখ্যার কল্লোলে মুদ্রিত হইল।

আজ সকল দেশের তরুণ সমাজ মানুষের এই ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা হইতে কিসে মানুষ মুক্ত হইতে পারে তাহাই চিন্তা করিতেছে। কেবল যে বয়সে তরুণ যাহারা তাহারাই এরূপ চিন্তা করিতেছে তাহা নহে, প্রাচীন হইলেও অন্তরে যাঁহাদের আজও তরুণত্ব আছে, নবজীবনের আকাঙ্ক্ষা যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাও এই চিন্তা করিতেছেন। এই কারণে তাঁহারাও তরুণ। তরুণ বলিতে তাঁহাদেরও বুঝায়।

প্রত্যেক দেশেরই সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতির অপব্যবহার দেখিয়া তরুণ সমাজ ক্ষুব্ধ। তাই তাহারা যাহা সত্য তাহাই নানা আকারে গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া উদাসীন জনসমাজের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। সত্য অনেক সময়ে নিষ্করুণ হয়, তাহার বাহিরের আবরণ হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। সত্যকে অনেকে তাই ভয় করে। লোকের কাছে সৎ হইয়া থাকিবার প্রলোভন সকল দেশের লোকেরই আছে, এ দেশের লোকেরও আছে। অনেকেই যাহা লুকাইয়া ছাপাইয়া করিয়াও নির্ব্বিবাদে কাল কাটাইতেছিল, প্রকাশ্যে তাহাই আলোচিত হইতেছে দেখিয়া তাহারা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই তাহারা ঐ সকল রচনাকে কুরুচি বলিয়া

আখ্যা দিতে চেষ্টা করে। তরুণেরা বলে, নিজেদের দোষ দুর্ব্বলতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করাই কুরুচির পরিচয়। তাহারা মনে করে দেশের এমন একটা অবস্থা আসিয়াছে যে, দেশের সমাজ, ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রে যে সকল গ্লানি রহিয়াছে তাহা নিজেদের স্বীকার করা প্রয়োজন এবং এই অপরাধ স্বীকার করিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহা অপসারণ করার চেষ্টা করাও আবশ্যক। তাই কেহ কেহ সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই চেষ্টা করিতেছে। এরূপ চেষ্টাবেই কেহ কেহ আবার আধুনিক সাহিত্য বা নবসাহিত্য বলিয়া উপহাস করিতে চেষ্টা করে।

পাণ্ডায় অত্যাচার সকল তীর্থেই আছে কিন্তু তাই বলিয়া দেবপূজা বা তীর্থগমন বন্ধ হয় নাই। সাহিত্য-তীর্থেও পাণ্ডার অত্যাচার ছিল, এখনও আছে। সেই জন্য সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-সাধনা কোনও কালে বন্ধ হয় নাই, বন্ধ হইবে না। এককালে রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন তরুণ ছিলেন। তাঁহাদের তখনকার সাহিত্য-চর্চ্চাকেও পাণ্ডার অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পাণ্ডারা ব্যবসায়ী, পাণ্ডাগিরি তাহাদের ব্যবসা। তাহারা বড়লোক ধরিয়া তাহাদের ব্যবসা চালায়। বড় লোকেরও অনেক সময় মস্তিষ্ক ঠিক থাকে না। পাণ্ডার স্তোক বাক্যে তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের নিজ অবস্থা ও পদমর্য্যাদার অনুপযুক্ত অনেক কাজ করিয়া বসেন। যাহারা সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া নিরন্তর নানাভাবে তোষামোদ করে, অনেক বড় বড় লোকের পক্ষে ঐ সকল লোকের আব্দার উপেক্ষা করা কঠিন হয়। তাই বড় লোকেরাও অনেক সময় এমন কাজ করিয়া বসেন যে তাহাতে তাঁহাদের নিজ মর্য্যাদারই হানি হয়।

তরুণের লেখার ভিতর যে সকল অসংযম ও অন্যবিধ দোষের কথা উল্লেখ করিয়া পাণ্ডারা তরুণদের অপদস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রবীণ লেখকদের মধ্যেও এই সকল দোষ ততোধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু বড়দের নিন্দা করিলে নিজেদেরই কোনও অস্তিত্ব থাকে না, এই ভয়ে পাণ্ডারা সে সকল কথা প্রকাশ করিতেই সাহস করে না। এই পাণ্ডাদের মধ্যে সকলেই যে কিছু বয়সে প্রাচীন এমন নহে। বয়সে তরুণ এমন অনেক প্রবীণ-পাণ্ডা বর্ত্তমান সাহিত্যের জঞ্জাল ঝাঁটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহারা ইহাদের সংস্কার অনুযায়ী কাজ করে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। এই অল্প সংখ্যক প্রবীণ-পাণ্ডা বড়লোকের চাদরের কোণটুকু তুলিয়া দিয়া, বড়-লোকের কথায় চাটুকারের মত নির্ব্বোধের হাসি হাসিয়া বা

ওয়েল্ স্-এর পত্রের প্রতিলিপি

EASTON GLEBE
DUNMOW

Warmest greetings to your friendly band
and all good wishes to Kallol.
An Englishman should be a good Englishman
& a Bengali should be a good Bengali but
also each of them should be a good World
Citizen & both fellow workers in the great Republic
of Human Thought & Effort

H. G. Wells

Feb 14th 1925

বড়লোকের ফটো তুলিয়া সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইতে যখন চেষ্টা করে তখন দেশের লোক সত্যই তাহাদের সাহিত্যিক বলিয়া মনে করে। এরূপ মনে করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ যে দেশে কবির প্রশংসা পত্র ছাপাইয়া তেল বা বই বিক্রী হয়, সে দেশে প্রসিদ্ধ কোনও কবি বা সাহিত্যস্রষ্টার গা ঘেঁষিয়া থাকিয়া কতগুলি লোক যে সাহিত্যিক বলিয়া বাজারে চলিয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। মাথার তেলে তেলের অংশ কিছু থাকে, বিজ্ঞাপনের উপর বিশ্বাস করিয়া সে তেল মাখিলে চুলের উপকার হইবারই কথা। কিন্তু যে সকল লোকের নিজস্ব কিছুই নাই, কায়দা দোরস্ত ভাবে পরের কাঁশি বাজাইয়া আপন বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বেড়ায় তাহাদের স্থান যে দেশের সাহিত্যে নহে তাহা দেশের লোক জানিয়াছে।

সুখের বিষয় বর্ত্তমান যুগের তরুণ সাহিত্যসেবীরা কেহই ঐরূপ 'সাহিত্যিক' হইবার চেষ্টা করে না। তাহারা সকলেই সাহিত্যের সেবা মাতৃপূজা মনে করিয়া কেবল সেবকের আনন্দটুকু পাইয়াই কৃতার্থ। তাহাদের এই সংযমটুকু ও আত্মবিচারের ক্ষমতা আছে বলিয়াই বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও আজ তাহারা দেশের লোকের নিকট সম্ভাষণ পাইয়াছে।

———

এতকাল তরুণ লেখকদের লইয়া অনেক লোকেই ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছে। তরুণরা তা গ্রাহ্য করে নাই। কেহ একটা প্রতিবাদও করে নাই। কারণ তাহারা জানে যে সকল সমালোচক আজকাল বাজারে নাম কিনিতে নামিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা তাহারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে বা ক্ষমতায় কম নহে। তাহারা এ সকল সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে থাকিতে চাহে। এবং ইহাই সত্যিকারের সাহিত্যিকের attitude. কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়াও রক্ষা নাই। যাহারা propagandist তাহারা তরুণদের এরূপ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলে, ইহাদের কিছু বলিবার নাই, কোন্ মুখে আর কথা বলিবে, তাই চুপ করিয়া আছে। আজও যে তরুণরা এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইতেছে তাহা নহে। তবে যাহারা বাস্তবিক দেশের সাহিত্যের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল চাহে এমন অনেক তরুণ এ সব আলোচনা লইয়া কিছু কিছু ভাবিতেছে। তাহাদের অপরাধ কি, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। কোনও সমালোচকই কোনও তরুণের বিশেষ কোনও লেখা লইয়া ত্রুটি দেখাইয়া দেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও তরুণ লেখকের লেখার মধ্যে হয় ত অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বাঙলার তরুণ কি দোষে দোষী তাহা তাহারা স্পষ্ট জানিতে চাহে। ইহা তাহাদের ঔদ্ধত্য নয়। ইহা তাহাদের challenge. সত্যই তাহারা জানিতে চাহে তরুণের কোন্ কোন্ লেখার বিশেষ কোন্ ত্রুটিতে আজ বাঙলা দেশ হঠাৎ একেবারে ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে, সমাজ দূষিত হইতেছে, সাহিত্য কলুষিত হইতেছে।

———

বাঙলার কোনও তরুণই চাহে না, তাহাদের কোনও দোষে বাঙলা সাহিত্য বা সমাজ দূষিত বা কলঙ্কিত হয়। দেশের সাহিত্য বা সমাজ সকল দিক দিয়া উন্নত হউক ইহাই তরুণ মনেরও কামনা। সে কামনা কল্লোলের তরুণ লেখকের মনেরও এবং যাহারা কল্লোলে লেখে না তাহাদেরও। কল্লোলের লেখকের মনের কামনা বলিয়া কোনও ভিন্ন কামনা থাকা সম্ভব নহে। এ দেশের বিজ্ঞ, বিচক্ষণ তরুণ বা প্রবীণ, অনেকেই কল্লোলে লিখিয়াছেন। কল্লোলের কামনা বলিয়া কোনও দোষারোপ করিলে যাঁহারাই কল্লোলে লিখিয়াছেন, সকল লোকের উপরই এই কামনার দোষ চাপান হয়। অবশ্য বাহবা পাইবার লোভে কেহ যদি কল্লোলের কামনা বলিয়া উপহাস করিবার লোভ এড়াইতে না পারেন তাঁহাকে আমরা এ আলোচনা হইতে বাদ দিতে প্রস্তুত আছি। কারণ এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নিজের পাণ্ডিত্যের দণ্ড এরূপভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ নাই।

———

কল্লোলকে যাঁহারা ভালবাসেন, কল্লোলকে নিজের লেখা দিয়া যাঁহারা তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তরুণদের লেখাকে যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সম্ভাষণ জানাইয়াছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ যদি আজ হঠাৎ অবস্থার বিপাকে পড়িয়া কল্লোল বা তরুণদের দ্বারা পরিচালিত কোনও পত্রিকাকে পরিহাসচ্ছলেও রাবিশ বলিয়া উল্লেখ করেন তবে তরুণের পক্ষ হইতে বলিবার আর কোনও পথ থাকে না। যাঁহারা বয়সে জ্যেষ্ঠ, সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ, বিদ্যায় অগ্রজ সমান তাঁহাদের নিকট তরুণ শিক্ষা লইতে প্রস্তুত কিন্তু অকারণ অপমান সহিতে প্রস্তুত নহে। বাংলার কোনও তরুণ লেখক বা লেখিকা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহে, এবং যদি প্রয়োজন হয়, পাণ্ডিত্যের উপদ্রবকেও তাহারা যথোচিত আঘাত দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। শিশু, কিশোর, তরুণ বা বৃদ্ধ কেহই জীবনে কোনও অযথা উপদ্রব সহ্য করিতে চাহে না ; সাহিত্যক্ষেত্রেও নহে।

কতগুলি তুলনামূলক কথার ফাঁদ পাতিয়া অতিশয় মামুলী কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আধুনিক সাহিত্য ও তাহার লেখক সম্বন্ধে নিন্দা করা কাহারও পক্ষেই কঠিন কাজ নয়। অতখানি নামিয়া আসিতে ইচ্ছা করিলে তরুণেরাও তাহা পারে। কিন্তু তরুণ দাবী করিতেছে স্পষ্ট কথা। বাঙলার তরুণ সত্যই জানিতে চাহে তাহাদের ত্রুটি কোথায়? যে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে তরুণরা দূষিত হইতে দেখিতে চাহে না।

তরুণেরা ভুল করে, ভ্রান্তি করে। তাহা তরুণের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। যাহারা প্রবীণ হয় তাহাদের পক্ষে ভুল না হইবারই কথা। কারণ তাহারা ভুলভ্রান্তি করিবার বয়স পার হইয়া আসে। কল্পনা, ধারণা বা চিন্তার যাবতীয় স্তর পার হইয়া অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হইয়া অধিকাংশ মানব এই প্রবীণত্ব লাভ করে।

কিন্তু এরূপ প্রবীণের লেখায় চিৎপুরের রাস্তার ন্যাঙ্গোট-পরা সাহিত্য দেখিয়া তরুণরাও স্তম্ভিত হয়। তবু আচার্য্যের হাতের প্রথম নিক্ষিপ্ত বাণ যতই অকরুণ হউক ধর্ম্মযুদ্ধে তরুণ তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইয়াছে।

একমাত্র সত্য উপলব্ধিই জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। তরুণরা আজ এই উপলব্ধি দ্বারা পৃথিবীকে জীবনের পরিপূর্ণতায় সুন্দর দেখিতে চাহে ; ইহা তরুণের ধর্ম্ম। তরুণ ও তরুণীর হৃদয় ভাবে ও আবেগে পরিপূর্ণ থাকে। এই আবেগ অন্তরস্থিত প্রেমের প্রস্রবণ। মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য—প্রেম। এই প্রেমকে সর্ব্বপ্রথম তরুণই জীবনে উপলব্ধি করে। এই প্রেমধারার স্পর্শে তরুণ নর-নারীর প্রাণ সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণে ও সৌন্দর্য্যে নিযুক্ত হইতে চাহে। কদর্য্যতা তাহাকে পীড়া দেয়, অসত্য তাহাকে অসুখী করে। তরুণ বয়সে মানুষের অন্তরলোকে যে এক মানবতার অস্পষ্ট মূর্ত্তি তিলে তিলে জাগিয়া ওঠে, তরুণ নর-নারী সেই মানবতাকেই জনে জনে মূর্ত্ত হইতেছে দেখিতে চায়। তাই তাহারা বর্ত্তমানের সমস্ত-ঐশ্বর্য্য ভাঙ্গিয়া সৌন্দর্য্যের মন্দির গড়িতে চাহে।

তরুণ তরুণীর এই মনের কামনাকে যুগে যুগে বহুভাবে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে। আজ যাঁহারা বয়সে প্রাচীন তাঁহারাও তরুণ মনের এই কামনার দেখা পাইয়াছিলেন। কামনা থাকে বলিয়াই তরুণের প্রতি পদক্ষেপেই পথও জাগে। কিন্তু মানুষ যেই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করিতে আরম্ভ করে অমনি সে সমালোচক হইয়া পড়ে। সমালোচক হইয়াই মানুষ সমগ্র মানবতা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। চিন্তার রাজ্যে তাহারা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তাই তাহাদের সম্মুখ হইতে পথের রেখাও মুছিয়া যায়।

কিন্তু যে পথ বাহিয়া পৃথিবীর প্রান্ত হইতে পরিব্রাজকের দল ভারতবর্ষের পরিচয় লইতে আসিয়াছিল, যে পথ বাহিয়া ভারতের পরিব্রাজক পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তরুণভারতের চক্ষে আবার সে পথের চিহ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে। তরুণ তাহার কল্পনার চক্ষে দেখিতেছে এক স্তিমিতাক্ষী, মহীয়সী বসুন্ধরা—উদার, শক্তিময়ী।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রায় একজন তরুণ সাহিত্যসেবক ছিলেন। তাঁর ভিতরেও ঐ একটা বিশ্বাস ছিল যে, যদি কারুর লেখার মধ্যে সার জিনিষ কিছু থাকে তা ছোট কাগজে প্রকাশিত হলেও তাহার বৈশিষ্ট্য বিকাশ পাইবেই। এই জন্য তিনি বড় কাগজের আপিষে গিয়া লেখা লইয়া কর্ম্মচারীদের বা সম্পাদকের খোসামোদ করিতেন না। সুশীলবাবুর প্রায় ১০৭-টি ছোট গল্প বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অর্চ্চনা পত্রিকায় তাঁহার 'সিঁথির সিন্দুর' ও 'চিরপরিচিত' বলিয়া উপন্যাস দুইখানি প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে 'বাঁশরী' পত্রিকায় "হারানো সুর" নামক অপর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

বহুকাল হইতেই সুশীলকুমার সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কল্লোলেও তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার অপর কয়েকজন সাহিত্যসেবী বন্ধু কল্লোলের সহিত বিশেষ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন্। কিছুকাল পরে 'আলোক' পত্রিকায় তাঁহারা যোগদান করেন।

সুশীলকুমার অমায়িক ও সুপুরুষ ছিলেন। দেশীয় সাহিত্য সকলদিক্ দিয়া পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া উঠুক ইহাই তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু অতি তরুণ বয়সেই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত এই দরদী বন্ধুটির মৃত্যুসংবাদ পত্রস্থ করিতেছি।

কল্লোলের এখন পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে। ইহার প্রতি সকলের সহানুভূতি ও অনুরাগের নিদর্শন পাইয়া আমরা কৃতার্থ। বৎসরের প্রথম হইতে সংখ্যাগুলি একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। বৈশাখ হইতে আর কাগজ নাই। এখন পূর্ব্ব সংখ্যাগুলি পুনঃপ্রকাশ করাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই কারণে বন্ধুবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন এ বৎসর আর গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা না করেন। এ জন্য আমরা দুঃখিত এবং বন্ধুগণও দুঃখিত হইবেন জানি। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এরূপ নিবেদন করিতে বাধ্য হইলাম।

ছোট গল্পের কথা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আজকাল বাঙলা দেশের সাময়িক পত্রগুলিতে যত ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, তাহার অধিকাংশই কস্মিন্‌কালেও না-লেখা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের খুব মস্ত বড় একটা ক্ষতি তো হইতই না, বরং অনেকখানি জঞ্জালের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বীণাপাণি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেন, এ-কথা অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে। এ-কথা অবশ্য ঠিক যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখক এ-দেশে নাই; তরুণদের মধ্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়-তো দু' একজন আছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা এখনও স্ফুটনের অপেক্ষা রাখে। অথচ পাঠক-সমাজের গল্প-পাঠ-লালসা এতই তীব্র যে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পাদকদের নিয়মিতরূপে গল্প সরবরাহ করিতেই হয়, এবং একই কারণে মোটা মোটা অনেক পত্রিকা দশ সহস্রাধিক কাটিয়া যায়। যথার্থ পঠন-যোগ্য গল্পের অভাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনাই পাঠকদের হাতে দিতে সম্পাদকরা বাধ্য হন্, আবার ক্রমাগত নিকৃষ্ট বস্তু-সেবনের ফলে পাঠকদের রুচিও এমন বিকৃত হইয়া যাইতেছে যে, ভালো জিনিষের মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহারা হারাইতে বসিয়াছে।

শ্রুতিকটু হইলেও এই কথাগুলি সত্য। এই সব কথা স্বীকার করিতে বেদনাবোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু লজ্জার কোনো কারণ নাই। বরং আমরা যদি মনে করিয়া বসি যে, আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র জন্মাইয়াছেন বলিয়াই আমাদের সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম, তাহা হইলে নিজেরাও লজ্জিত হইব, অপরকেও লজ্জা দিব। আমাদের দেশে গল্প-সাহিত্যের দৈন্যের হেতু কি, তাহাই ভাবিয়া দেখা দরকার। যাঁহারা নবীন লেখকদের তিরস্কার ও উপহাস করিয়াই মনে করিতেছেন, সাহিত্যের একটা খুব বড় সেবা করা গেল, তাঁহাদেরও বিবেচনা করা উচিত যে, তরুণদের অসংখ্য দোষ ত্রুটির জন্য কি তাঁহারা একাই দায়ী, না এমন কোনো কারণও আছে, যাহা প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদিগের অশুভ-সাধন করিতেছে, অথচ যাহা দুর করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত।

২

বাঙলাদেশ ছোটগল্পের দেশ নয়, ইহা কবিতার দেশ। বাঙালীর ভাব-প্রবণতা এতদূর পরিণতি লাভ করিয়াছে যে, তাহার সাহিত্যে ভাবাবেগেরই (emotion) উৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায়; এই জন্যই বৈষ্ণব কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ দেশে এত উচ্চশ্রেণীর কবি এত উচ্চশ্রেণীর গীতি-কাব্য লিখিয়াছেন, এবং এখনও লিখিতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুভূতি সম্বল করিয়া ছোটগল্প সৃষ্টি করা যায় না, তাহাতে দরকার ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানব-চিত্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কবিতায় যখন পড়ি

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়"

তখন শোনায় ভালো; কিন্তু ঐ কথা গদ্যে লিখিলেই তাহা গল্প হইত না, যেমন রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা"র অন্তর্গত একটি রচনাও গল্প-পদ-বাচ্য হয় নাই। ঘটনা না হইলে গল্প হয় না, অথচ অধিকাংশ বাঙলা গল্পই ঘটনাহীন সুসজ্জিত ফেণপুঞ্জ। বাঙালী কিছুতেই তাহার ভাব-প্রবণতাকে বাদ দিতে পারে না—উহা তাহার মজ্জায় মজ্জায় বসিয়া গেছে। ঐ জন্যই মনে হয়, বাঙ্‌লা দেশ ছোটগল্পের দেশ নহে,—এখানে কোনোদিন মোপাসাঁ কি চেহভ্‌ জন্মাইবে না।

কেহ যেন অবশ্য মনে করিয়া না বসেন যে, ছোটগল্পে ভাব বা emotion-এর কোনো স্থান নাই—এ-কথা আমি বলিতে চাহিতেছি। হৃদয়াবেগ নিশ্চয়ই থাকিবে, তবে তাহা যেন লেখকের নিজের আবেগ না হয়। প্রথম শ্রেণীর কথা-শিল্পী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহার পারি-পার্শ্বিক জগৎকে দেখিবেন; তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহ বা করুণা, রাগ বা বিদ্বেষ, কিছুই যেন তাঁহার দৃষ্টিকে অনু-রঞ্জিত করিতে না পারে। তাহা হইলেই যে-সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন, তাহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি তাঁহার চোখে স্পষ্টতর হইয়া ধরা পড়িবে। শ' এক-জায়গায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার মনের দৃষ্টি normal—অর্থাৎ জগৎটা ঠিক যেমনটি, তিনি তেমনটিই দেখিতে পান, যাহা শতকরা নিরানব্বুই জন লোক পারে না। বাঙলার লেখকদেরও এই 'normal eye-sight'-এর একান্ত অভাব। হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে facts ঢাকা পড়িয়া যায়, অথচ facts—অর্থাৎ ঘটনাবিহীন ছোটগল্প অনেকটা হ্যাম্‌লেট্‌-বিহীন হ্যাম্‌লেট্‌ নাটকাভিনয়ের মতই।

৩

বাঙ্‌লা ছোটগল্পের আরম্ভ রবীন্দ্রনাথকে দিয়াই বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রচুর তথাকথিত ছোটগল্পের মধ্যে বড়গল্প বা novelette-এর সংখ্যা অনেক হইলেও উৎকৃষ্টতম শ্রেণীর ছোটগল্পও তাঁহার সাহিত্যে আমরা পাই। এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, শুধু তাহাকেই ছোটগল্প বলা যাইতে পারে, যাহা 'ছোটও বটে এবং গল্পও বটে'। একটি ঘটনার বিবর্ত্তনে একটি চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলা এবং তদ্দ্বারা পাঠকের মনে একটি মাত্র impression করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন-করিয়া-আনা একটি মাত্র ঘটনার আলোতে ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র যতটুকু ফুটিল, তাহার বেশি দেখাইবার প্রয়োজন নাই। যথার্থ ছোটগল্প রচনায় ফরাসী কথা-শিল্পীগণ অদ্বিতীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোপাসাঁর "The Umbrella", "The Necklace" ইত্যাদি বহু গল্পের নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা", "কঙ্কাল", "ক্ষুধিত পাষাণ" ইত্যাদিকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্প বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে

পারে। ছোটগল্প-লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরেই চারুবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নামে না থাকিলেও তাঁহার রচনায় শ্রী আছে। তাঁহার "বন্ধু", "দেয়ালের আড়াল", "বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ" প্রভৃতি গল্প প্রথম শ্রেণীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎবাবুর ছোটগল্প "মহেশ" "অভাগীর স্বর্গ" চমৎকার ছোটগল্প। তাঁহার 'রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি রচনা ছোটগল্প নহে, উৎকৃষ্ট উপন্যাস। উল্লিখিত উপাখ্যান দুইটি হইতে বাছিয়া নিয়া যে-কোনো একটি episode লইয়া চমৎকার ছোটগল্প লেখা চলিত। "ছবি" ইত্যাদি গল্প সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা চলে। প্রভাতবাবু অনেক সুখপাঠ্য ছোটগল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু কালের নিকষমণিতে সে-গুলি কতদিন পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারিবে, তাহা অনুমান করিয়া বলা শক্ত। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কথা-সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ অল্প, কিন্তু তাঁহার "আহুতি' ও "চার-ইয়ারী-কথা"র প্রত্যেকটি গল্প সম্বন্ধে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, it is worth its weight in gold.

অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্প-লেখকদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর নাম। বছর কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার ছোটগল্প বঙ্গদেশের মাসিক পত্রিকাগুলির একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার রচনায় বর্ণনার উচ্ছ্বাস ছিল, ভাষার কারুকার্য্য ছিল, কিন্তু ছিল না ঘটনা, ছিল না গতি। তাঁহার অধিকাংশ গল্পেই বিদেশী গল্পের গন্ধ এত প্রবল ছিল যে, যথার্থই মনে হইত, কাগজ কাটিয়া এই ফুল তৈরী করা হইয়াছে, তাহাও আবার বিলাতী। লেখার ভঙ্গীতে তিনি হয় তো টুর্গেনিভ্-পন্থী হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু টুর্গেনিভের মধ্যে যে সাবলীল গতিচ্ছন্দ, যে সহজ স্বাভাবিক মাধুর্য্য পাই, তাহা তাঁহার মধ্যে পাই না; তাঁহার রচিত মধুচক্র মাঝে-মাঝে কৃত্রিম ঠেকে। অল্প বিষয় লইয়া বিরাট বাক্‌বিস্তার করা তাঁহার প্রধান দুর্ব্বলতা। তবু এ-কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, তাঁহার মধ্যে ক্ষমতা ছিল; তাঁহার "জন্ম-জন্মান্তর" "নিশীথের কথা" যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ-কথা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে তিনি গল্পরচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়; ইহা যে বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে মোটেই সুখের বিষয় নহে, এ-কথা ঠিক। গোকুলচন্দ্র নাগের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অনুমানে নিরূপণ করা যায় না। তবে 'মাধুরী' "ব্যথার প্রদীপ" 'বসন্ত বেদনা'র মধ্যে তিনি যে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সুযোগ পাইলে আরো সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিত, ইহা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়।

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই গল্প-সাহিত্যে তাঁহার নিজস্ব একটি আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কয়লার খনির কুলিদের জীবন নিয়া sketch লিখিয়াই তিনি প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত হন, কিন্তু তাঁহার "অতসী" পুস্তকের অন্তর্গত গল্পগুলিই তাঁহার প্রতিভার যথার্থ সাক্ষ্য দিতেছে ও দিবে। 'যুবনাশ্ব' নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের জীবন নিয়া গল্প লিখিয়া খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই-ই যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার রচনাভঙ্গী জোরালো, এবং যে-বিষয় নিয়া তিনি লিখিয়া থাকেন, সে-বিষয়ে তাঁহার হয় তো প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, সেই জন্যই তাঁহার গল্পগুলি কৃত্রিম অথবা ধার-করা মনে হয় না। তবে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই একটু sketchy ধরণের, ঠিক ছোটগল্প বলা যাইতে পারে, এমন লেখা তাঁহার অল্পই আছে। তবু এ ক্ষেত্রে pioneer-রূপে তাঁহার নাম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে থাকিয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এ-পর্য্যন্ত অল্প কয়েকটি গল্পই লিখিয়াছেন, কিন্তু সেই কয়টি দিয়া বিচার করিলেও নব-যুগের প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয় না। তাঁহার "শুধু কেরানী" "গোপন-চারিনী" "চিত্রা" "সংক্রান্তি" "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে"—প্রত্যেকটিই অনুপম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র মিত্র তরুণ, তাঁহার নিকট হইতে আরো অনেক কিছু আশা করিবার অধিকার আমাদের আছে। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পরচনায় বড় মিঠা হাত। তাঁহার "গুমোট" ও "চোখের চাতক" "টুটা-ফুটা" "সন্ধ্যা

রাগ"-এ তিনি এ কথা প্রমাণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া সাহিত্যে একটি নবযুগ আনয়ন করিতে চাহিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহাদের সমান বা তাঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ক্ষমতাশালী লেখকের সংখ্যা এত কম যে, এই নবযুগের কোনো একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

৪

বাঙ্‌লা গল্প-সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতেই ইহার দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিন লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন—ভিতরকার উৎস যেন অতি অল্প সময়েই শুকাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যশস্বী বাঙালী কবির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ছোট-গল্প জিনিষটি বাঙ্‌লার মাটিতে ভালো ফলে না।

আমাদের দেশের লেখকদের অধিকাংশ গল্পই যে চলনসইও হয় না, তাহার প্রধান কারণই এই যে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই পরিমিত। জীবনটা বিচিত্র, বিরাট ও সকল দিকে সমভাব প্রস্ফুটিত না হইলে গল্পও যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নীরস হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? আমাদের জীবন যেমন বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে, গল্পও তেমনি। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ—বিশেষ করিয়া সমাজ—আমাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, জীবনটাকে সব দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া দিতেছে, কোনোদিক দিয়া মানুষ একটু ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। সহস্র নিষেধের বিড়ম্বনা যাহাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্ত লাঞ্ছিত করিতেছে, অনুশাসনের অত্যাচারে যেখানে একটু হাত-পা মেলিয়া চলাফেরা করা যায় না, চারিদিক হইতে পর্দ্দা যেখানে চোখের দৃষ্টিকে অবরোধ করে, সেই দেশে, সেই জাতির মধ্যে একটা বিরাট, প্রাণবন্ত গল্প-সাহিত্যের সৃষ্টির কল্পনা চিরকাল কল্পনাতেই রহিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের ভয় হয়। যাঁহারা বাঙ্‌লা গল্পের একঘেয়েমি দেখিয়া নাক সিঁটকান, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যে-দেশে কোনো পুরুষকে একটা প্রণয়ের ব্যাপার বিজড়িত করিতে হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ, বন্ধুর বোন, বোনের বন্ধু বা বাজারের স্মরণাপন্ন হইতে হয় (এতদ্ভিন্ন অন্য সবই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে), সে দেশের গল্প-সাহিত্যে কতটা বৈচিত্র্যই বা আশা করা যাইতে পারে। এ-সূত্রে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "চারইয়ারী কথা"র প্রতিটি গল্পেই যে বিলাতী atmosphere-এ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা অনেকটা বাধ্য হইয়াই করিয়াছেন; কারণ বাঙলাদেশে বাঙালী সমাজের মধ্যে ঐ ধরণের ঘটনা কখনো ঘটিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে বিলাতী সমাজের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। অথচ, প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই যে একটি চমকপ্রদ বৈচিত্র্য আছে, তাহা না বলিলেও চলে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, সমাজের নাগপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে আমাদের সাহিত্য নব নব আস্বাদিত রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

অনেকে বলিবেন যে, যাহা আছে, তাহার ভিতর হইতেও অনেক মাল-মশলা বাহির করা যায়, ক্ষমতা থাকিলে পুরাতন জিনিষকেই নূতনরূপ দেওয়া যায়—ইত্যাদি। ক্ষমতা থাকিলে পুরাতন জিনিষকে নূতনরূপ দেওয়া যায়, এ-কথা সহস্রবার মানি; শরৎবাবুই "রামের সুমতি" ইত্যাদি গল্পে ইহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শরৎবাবুর মত বিরাট প্রতিভা সকল দেশেই দুর্লভ; সকল দেশেই এমন এক শ্রেণীর লেখক থাকেন, যাঁহারা সুযোগ পাইলে বেশ ভালো গল্প লিখিতে পারেন, অথচ কেবলমাত্র সুযোগের অভাবে একেবারে নষ্ট হইয়া যান্। বাঙ্‌লা দেশের সেই শ্রেণীর লেখক একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এবং সে-জন্য সমাজের এই অমানুষিক বন্ধনই দায়ী, এই কথাটাই আজ আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝা দরকার। ইয়োরোপের অনেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও এমন সব গল্প লিখিয়া থাকেন, যাহা পড়িয়া প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা সকলেই কিছু একটা বিরাট

প্রতিভা লইয়া জন্মাইয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা জীবনে অনেক কিছুই জানিবার, দেখিবার এবং বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং সেই সকল অভিজ্ঞতার উৎস হইতেই তাঁহারা নব নব রস আহরণ করিতে সক্ষম হন্। আমাদের দেশের তদ্রূপ ক্ষমতাশালী লেখকরা কিছুই লিখিতে পারেন না, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক জীবনে নূতন কিছুই ঘটে না যাহা তিনি দেখেন, তাহা বহু পূর্ব্বেই পূর্ব্বতন শিল্পীদের দ্বারা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, ইহাও জিজ্ঞাসা করি, শরৎবাবুর মধ্যেই কি পুনরাবৃত্তি দোষ নাই? তাঁহার "বিন্দুর ছেলে," "রামের সুমতি," "বড়দিদি" ও 'মেজদিদি' প্রকৃতপক্ষে কি একই গল্প নহে? এই বিভিন্ন চারিটি গল্প না লিখিয়া একটি—কি বড়জোড়, দুইটি লিখিলেই কি চলিত না? আমাদের সমাজ বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ হইলে বিভিন্ন ধরণে চারিটি উৎকৃষ্ট গল্প কি লেখা যাইত না?

সামাজিক বন্ধনের অত্যাচার ও আইনের নাগপাশ যে কতবড় সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা এতদিনে বুঝিবার সময় হইয়াছে। হতভাগ্য গল্প-লেখকদের তুণ্ডচিত্তে গালি-গালাজ না করিয়া এই সব বাধাবন্ধ অপসারিত করিয়া জাতীয় জীবনটাকে স্বচ্ছন্দ ও স্রোতঃবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীদের চক্ষে অধিক সুশোভন হয়। এই পঙ্কিল কূপ-মণ্ডুকতা বর্জ্জন করিয়া যতদিন আমরা জীবন-সমুদ্রের সমগ্র বিরাট্ স্রোতধারা তাহার উদারতা ও গভীরতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে না পারিব ততদিন দেশের সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ হওয়া অসম্ভব।

যুগদীপ—সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল্য প্রতি সংখ্যা ১০ পয়সা, বার্ষিক ২॥০ টাকা। সম্পাদক—শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়। বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত। মোহঘোরে ঘেরা অন্ধ ভারত মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় না, সে পথ উজ্জ্বল করিতে 'যুগদীপ' জলিয়া উঠিয়াছে। ভারতের পথে পথে যুগে যুগে এরূপ বহু দীপ জলিয়া জলিয়া নিভিয়া গিয়াছে; হয় ত ঐ সময়ের ভিতরই তাহাদের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'যুগদীপ' আজ এই যুগে বাঙলার এক প্রান্ত হইতে জলিয়া উঠিল, নিজ সার্থকতায় সে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ইহাই আশা করি।

———

আলপনা—ছোটদের মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৪০নং বাদুরবাগান ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ১০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা। শিশু-কবিতার অপূর্ব্ব রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছবি ও লেখার বিচিত্রতায় প্রতি পৃষ্ঠায় আলপনা আঁকিয়া গিয়াছে। এই পত্রিকা শিশুচিত্তে বিচিত্র রেখার ও রং-এর রেখাসম্পাত করিবে বলিয়াই আশা হয়।

———

স্বভাবের পথে—স্বাস্থ্য ও স্বভাব-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা; বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা মাত্র। কলিকাতা ২০-এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। নানাবিধ স্বভাব-চিকিৎসার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা এই পত্রিকার বিশেষত্ব।

———

'পল্লী-মঙ্গল' সমিতির দ্বিতীয় গ্রন্থ **গৃহস্থের টোট্‌কা-চিকিৎসা** প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

উক্ত সমিতির এই পুস্তকগুলি বাঙালার গৃহস্থমাত্রেরই বিশেষ উপকারী। ইহাতে যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে তাহার প্রত্যেকটিই পরীক্ষিত। আমাদের দেশের প্রাচীন গৃহিনীরা অনেকে এমন ঔষধ জানিতেন যাহা দ্বারা গৃহস্থের ঘরে অনেক নিত্যকার ব্যাধি আরোগ্য হইত। এখন সেই আসল ঔষধের আর প্রচলন নাই। লোক একে দরিদ্র, তাহাতে দেশ নানা উপদ্রবে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। রোগের সংখ্যা ও আক্রমণও সে জন্য এখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে গাছ-গাছরা ও অন্যান্য দ্রব্য হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হইত তাহাতে খরচ খুব কম ছিল। 'পল্লী সমিতি' পুস্তকাকারে সেই সকল ঔষধের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

———

প্রগতি—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ঢাকা ৪৭ নং পুরানা পল্টন হইতে প্রকাশিত। শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা; বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র। এই পত্রিকাখানি কিছু-কাল পূর্ব্বে হাতে লিখিয়া বাহির হইত। এই আষাঢ় মাস হইতে ইহা ছাপিয়া বাহির হইল। পত্রিকাখানি ছোট হইলেও ইহার লেখা প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয়, এই পত্রিকা পরিচালনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি ও আদর্শে বিশিষ্টতা আছে। আমরা এই পত্রিকাখানির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

নওরোজ—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৪৫-বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ।.০ আনা, বার্ষিক মূল্য ৪৷০ টাকা মাত্র। সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল্-উল হক্। পত্রিকাখানির প্রচ্ছদপট বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে অপূর্ব্ব হইয়াছে। বহু তথ্য ও রচনা সম্পদে এই পত্রিকাখানি মুসলমান পরিচালিত পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আষাঢ় মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ। কবি নজরুলের গান, গজল, কবিতা, নাটিকা, উপন্যাস প্রভৃতিতে প্রথম সংখ্যাখানি পরিপূর্ণ। ইহা ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অবনীন্দ্রনাথের রচনা, কাজী আবদুল ওদুদ্ সাহেব প্রমুখের রসরচনায় নওরোজ দীপান্বিত হইয়াছে। ধর্ম্মগত পার্থক্যের গণ্ডী এড়াইয়া এই পত্রিকাখানি সত্য সত্যই বাঙলা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি কল্পে নিয়োজিত হইবে আশা করি।

কাব্যদীপালি—শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৷০ টাকা মাত্র। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্ত্তী বাঙলার কবিগণের কবিতাবলী চয়ন করিয়া এই কাব্য-দীপালি সম্পাদিত হইয়াছে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীগণের বিচিত্র চিত্রে কাব্যদীপালি সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

এরূপ কবিতা-সংগ্রহ পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল। বইখানি সুবৃহৎ হইলেও পড়িয়া মনে হয় বইখানি আরও যদি বড় হইত! আরও অনেক কবির অনেক কবিতা যদি ইহাতে থাকিত! বর্ত্তমান সময়ের অনেক তরুণ কবির কবিতাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় ভুলক্রমে শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্চী, জসীম উদ্দীন প্রভৃতি আরও কয়েকজন কবির কবিতা ইহাতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তবুও এই বইখানি বাঙলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

কাগজ, ছাপা, সাজান, ছবি প্রভৃতি বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হইয়াছে, বইখানি একবার খুলিলেই তাহা বুঝা যায়।

স্বপ্নসাধ—কবিতা পুস্তক। তরুণ কবি হুমায়ুন কবির প্রণীত কবিতা-সংগ্রহ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। প্রায় চেতাল্লিশটি কবিতা ইহাতে আছে। হুমায়ুন কবির বাঙলা সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। এই পুস্তকের কতগুলি কবিতা সাময়িক পত্রিকাদিতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তরুণ শিল্পীর এই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ পাইবেন বলিয়া আশা করি।

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by K. Lahiri,

কল্লোল

তারা প্রেস, কলিকাতা.

কল্লোল

আশ্বিন, ১৩৩৪

চরকা

এক দৃশ্যের একাঙ্ক নাটিক

শ্রীমন্মথ রায়

দৃশ্য—কলিকাতায় রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের গৃহ। গৃহের দ্বিতলস্থ দুইটি কক্ষ মাত্র দেখা যাইতেছে। কক্ষ দুইটির সম্মুখ দিয়া বারান্দা, বারান্দার এককোণে সিঁড়ি-পথ, অপর কোণে রেলিং-ঘেরা একটুস্থান, সেখানে একখানি চৌকির উপর রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বিধবা বর্ষীয়সী মাতা কাত্যায়নী, হয় বসিয়া, না হয় শুইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটান।

তখন অপরাহ্ণ বেলা। রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় বারান্দায় চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন, তাঁহার কন্যা মমতা দেবী তাঁহাকে চা এবং জলখাবার পরিবেশন করিতেছেন। অস্তায়মান সূর্য্যের ম্লান আভা প্রাঙ্গনস্থ একটা নারিকেল গাছের পাতাগুলি স্বর্ণবর্ণে মণ্ডিত করিয়া পিতাপুত্রীর চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

মমতা। চা'য়ে কি আর একটু চিনি দেব বাবা?

রাজেশ্বর না মা! [চিন্তামগ্ন হইয়া চায়ে চুমুক দিলেন]

মমতা। বাবা!

রাজেশ্বর। [ডাক তাঁহার কানে গেল না]

মমতা। [নীরবে জল খাবার পরিবেশনে রত রহিলেন। ক্ষণকাল পর] ..বাবা!

রাজেশ্বর। [এ ডাকও তাঁহার কানে পশিল না]

মমতা। শোন বাবা!

রাজেশ্বর। [চমকিয়া উঠিলেন] কি মা?

মমতা। [পিতার চিন্তামগ্নতায় বিস্মিত হইয়া নীরব রহিলেন]

রাজেশ্বর। কি মা?

মমতা। কি ভাবছ তুমি?

রাজেশ্বর। [ম্লানহাস্যে] ভাবনার কি আমার শেষ আছে মা? ভাবছি আমার অদৃষ্টের কথা। ভাবছি তোদের কথা।

মমতা। সে তো চিরদিনই ভেবে এসেছ! কিন্তু আজ যে তোমাকে বিশেষ করে অবসন্ন মনে হচ্ছে।

রাজেশ্বর। [অন্য কথা পাড়িবার ছলে] আয় মা, এগিয়ে আয়! আয়! টুলখানা নিয়ে আমার পাশে এসে বোস্! আমার সঙ্গে সঙ্গে আজ তোকেও কিছু মুখে দিতে হবে! আয়!... কই? আ—য়! নইলে আমি এই চায়ের বাটি সরিয়ে রাখলুম কিন্তু, হ্যাঁ!

মমতা। তুমি খেয়ে যাও আমি তোমার প্রসাদ নেব এখন। আমি যে তা-ই ভালোবাসি বাবা!

রাজেশ্বর। আজ আর সে ফাঁকি চলবে না! তোর এই কচুরি আর পুডিং এত ভালো হয়েছে যে, ... না, আজ আর কিছুই পড়ে থাকবে না। কিন্তু, দিগ্বিজয়ের জন্য তুলে রেখেছিস তো?

মমতা। কখন্ বাড়ী আসবে কে জানে! সে আমি রেখে দিয়েছি। তুমি খাও বাবা!

রাজেশ্বর। তুই না খেলে আমি খাব না—

মমতা। আচ্ছা বাবা, আমি খাবো। কিন্তু, আগে তুমি বল, তুমি কি ভাবছিলে?

রাজেশ্বর। কিন্তু তা বললে তোর হাতের এই মিষ্টি চা এক্ষুণি তেতো হয়ে যাবে!

মমতা। আমি আবার চা তৈরী করে দেব। তুমি বল বাবা—

রাজেশ্বর। আশেপাশে আর কেউ নেই তো?

মমতা। [চারি দিক দেখিয়া] না।

রাজেশ্বর। আজ সাহেব স্পষ্ট বলে দিয়েছে, রাত্রের মধ্যে তাদের সন্ধান চাই—

মমতা। কাদের?

রাজেশ্বর। সেই মেঘনাদ রায়, আর অরিন্দম বসু—

মমতা। [চমকিয়া উঠিলেন] আজ রাত্রেই?

রাজেশ্বর। হাঁ, এই রাত্রেই! সঠিক্ সংবাদ দিতে পালে চাকুরি থাকবে, না পারলে—

মমতা। না পারলে?—

রাজেশ্বর। আজ রাত্রেই চাকুরি শেষ।

মমতা। খুব ভালো কথা বাবা! আজ রাত্রে আমি তোমাকে পোলাও মাংস রেঁধে খাওয়াব বাবা! তুমি আর বের হয়ো না! এখন ঐ ইজি চেয়ারখানা নিয়ে ছাতে চল। আমি গান গাইব, তুমি শুনবে। চল বাবা—

রাজেশ্বর। সে কি মা! এর মধ্যে তোর এত উল্লাসের কারণ কি দাঁড়াল?

মমতা। আজ আমাদের গোলামির অবসান হবে!... না বাবা, সঠিক সন্ধান দেওয়া তো দূরের কথা, আর সন্ধানেই প্রয়োজন নেই! ... বাবা!

রাজেশ্বর। [সহসা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া] আমি চললুম মা!

মমতা। [তাঁহার হাত ধরিয়া] বাবা!

রাজেশ্বর। [ঘড়ি দেখিয়া] না মা! বেলা শেষ হয়ে এল। এখনই আমাকে বের হতে হবে।

মমতা। না, আর বের হতে হবে না।

রাজেশ্বর। [শান্ত ভাবে পুনরায় বসিয়া] হুঁ। একটু চিন্তার পর] হুঁ। কিন্তু, চাকুরি গেলে তোদের খাওয়াব কি?

মমতা। [ক্ষণকাল নীরব রহিয়া] ... সে কি তোমার শুধু ঘরজামাই?

রাজেশ্বর। দিগ্বিজয়! আমার দিগ্বিজয় ... সে শুধু বেঁচে থাক্ মা!

মমতা। লালনপালন করা, মানুষ করা, সে তো তুমিই করেছ বাবা!

রাজেশ্বর। তা কি সে মনে করে? তবে তো দুঃখই ছিল না মা!

মমতা। সে কথা যে বিশ্বশুদ্ধ লোক মনে করে রাখবে, আর সে-ই মনে রাখবে না, তাই যদি হয়, তবে আমারো হয় ত ভুলে যাওয়া বিচিত্র নয় যে, সে এই বাড়ীরই কেউ!

রাজেশ্বর। ও হচ্ছে অভিমানের কথা মা! ওসব পাগলামি ক'রো না মা তুমি। সে নিজেই এক পাগল, কোথায় থাকে, কি করে সে-ই জানে! এম এ, পাশ দিয়ে বসে আছে, চাকুরি যদি কর্ত্তো ...

মমতা। চাকুরির তো তার অভাব নেই বাবা, কিন্তু, সবই অবৈতনিক। কিন্তু হলে কি হবে, ভাবনায় চিন্তায় রাত্রে ঘুম নেই। আমি বলি খুব ভালো কথা। রাতজেগে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, মরাপোড়ানো, সেবা-সদন খোলা, অস্পৃশ্যতা দূর করা, নাইট স্কুল চালানো—খুব ভালো কাজ, কতদিন কত যায়গায় আমিই তার সঙ্গে গিয়ে উৎসাহ দিয়েছি, সাহায্য করেছি, সভা সমিতিও করেছি, আমিও মেতে উঠেছিলুম, কিন্তু—

রাজেশ্বর। কিন্তু?

মমতা। কিন্তু, তোমার মুখের দিকেও তো তাকাতে হয়! তোমার বয়স হয়েছে, রোগে শোকে কাতর তুমি, এখন তোমার ছুটি চাই। কতবার বলেছি, তবু পালুম না। কি বলে জানো?

রাজেশ্বর। কি মা?

মমতা। ছুটি দেবেন ভগবান।

রাজেশ্বর। তবেই দেখ—

মমতা। কি বাবা?

রাজেশ্বর। বের না হয়ে আমার উপায় নেই, চাকুরি বজায় রাখতেই হবে।

মমতা। বাবা!

রাজেশ্বর। বাজারে আমার দেনার পরিমাণটাও যে তুই না জানিস তা নয়!

মমতা। বাবা!

রাজেশ্বর। বল মা!

মমতা। কলকাতার এই বাড়ী বেচে দাও। এই দিয়ে ঋণশোধ হোক্। তারপর—

রাজেশ্বর। তারপর?

মমতা।—দেশে ফিরে চল। পাড়াগাঁয়ে যা খরচপত্র তা আমরা সহজেই চালিয়ে নিতে পার্ব্ব। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার বই বাজারে ভালোই কাটছে, এই পুজোর সময় নতুন edition-এও কিছু পাব এখন—

রাজেশ্বর। তা হয় না মা! ঐ অথর্ব্ব বুড়ী মা রয়েছেন, ওঁকে এখন এখান হতে ওখানে টানাটানি করতে পারি নে। আর তা ছাড়া আমার দিগ্বিজয় কলকাত' ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইবে না, ওকে ছেড়ে আমিও অন্যত্র থাকতে পার্ব্ব না। সে হয় না মা। কথায় কথায় আমি বিলম্ব করে ফেললুম। এইবার আমি উঠি। আমাকে তাদের আড্ডায় যেতে হবে। যেতে হবে খুব সাবধানে। যতবার তাদের ধরতে চেষ্টা করেছি, প্রতিবার বিফল হয়েছি, কিন্তু, কেন যে হয়েছি, কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। আজ বিশবছর এই চাকুরি নিয়েছি, সুনাম সুখ্যাতির আমার শেষ ছিল না, লোকে আমায় হিংসে কর্ত্ত, আর এখন—এখন আমায় সকলে টিট্‌কারি দেয়, সাহেব কড়া কথা শোনায়, যাদের আমি হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি, তারা আমাকে ডিঙিয়ে ওপরে চলে গেল, কি বলব মা, শেষে নিজের শক্তির উপর অবিশ্বাস এসেছিল কিন্তু, আজ—আজ—

মমতা। আজ কি বাবা?

রাজেশ্বর।—আজ আমার অব্যর্থ সন্ধান। আজ আর পরিত্রাণ নেই!

মমতা। সে কি বাবা!

রাজেশ্বর। হাঁ মা, আজ আর তাদের পরিত্রাণ নেই। আজ তারা সব একটা বাড়ীতে একত্র হয়েছে, রাত্রে বোমা রিভলভার নিয়ে ডাকাতি কর্ত্তে বের হবে। কোথায় কখন্ একত্র হয়েছে কোথায় যাবে—সব জানি, আমি তার সব জেনেছি। আজ হয় আমার শেষ, না হয় তাদের শেষ। মা! তোরা খুব সাবধানে থাক্‌বি। আমি জানি, আমার মাথার ওপর ঐ স্বদেশী ডাকাতদের বহুদিন হতে নজর রয়েছে—

মমতা। বাবা! [মুখ নামাইল। পরে হঠাৎ সাগ্রহে] তুমি যেয়ো না বাবা! আমার বড় ভয় হয়।

রাজেশ্বর। না পাগ্‌লি! আজ আমার ভয় নেই। আজ আমার সন্ধান অব্যর্থ!

মমতা। এই স্বদেশী ডাকাত ধর্ত্তে গিয়ে বহুবার তোমার এমন অব্যর্থ সন্ধানই ব্যর্থ হয়েছে বাবা!

রাজেশ্বর। হাঁ, হয়েছে, আমি স্বীকার করি। আমার কাগজপত্র নক্সা, কে চুরি করে' দেখে পূর্ব্বেই তাদের খবর দিত।—হাঁ, নইলে অন্য কোন উপায়ে তাদের বাঁচবার পথ ছিল না। কিন্তু আজ আর সে ভয় নেই। রামলালকে তাড়িয়েছি কেন জানিস?

মমতা। তুমি বল্লে সে বুড়ো অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে, তাকে দিয়ে আর কোন কাজ হয় না। কিন্তু সে কথা তো সত্যি নয় বাবা, ঐ বয়সেও সে যা খাটতো, কই তোমার নতুন চাকর তো তাও পারে না! রামলালকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ বাবা, কিন্তু, তবু সে রোজই পথে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। বলে দিদি কোন্ দোষে তোরা আমায় এই বয়সে তাড়িয়ে দিলি! আমি যে তোদের না দেখে থাকতে পারি নে! দুই চোখ বেয়ে তার জল পড়ে!

রাজেশ্বর। আমি তার কোন দোষ পাই নি মা। হঁ, সত্যি কথা বলতে গেলে তার কোন দোষই আমি পাই নি। কিন্তু—

মমতা। কিন্তু?

রাজেশ্বর। কিন্তু, আমার কাগজ পত্র নক্সা আমার সমস্ত প্ল্যান্ তারা পূর্ব্বেই জানতে পারে কেমন করে? আমার ঐ এক সন্দেহ, হাঁ, সেই সন্দেহ! আর কিছু নয়! বেশ, তাকে না হয় কয়েকটা টাকা দিয়ে দিস!

মমতা। এই কথা? [ক্ষণকাল নীরব রহিলেন] শুদ্ধ একটা সন্দেহের বশে!... [মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিয়া] ছিঃ বাবা! অত দিনের বিশ্বাসী চাকর! আমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল! তোমার যখন কলেরা হয়েছিল, তখন নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমার সেবা

শুশ্রূষা করে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল! তাকে, তুমি শুদ্ধ একটা সন্দেহের বশে—বাবা! আজ তোমাকে আমি কয়েকটা রূঢ় কথা শোনাব। গোলামিতে তোমাকে পেয়ে বসেছে! শত্রু মিত্র চিন্‌বার শক্তি তুমি হারিয়ে ফেলেচ! শুধু এও তো নয়, তোমার এই গোলামির মোহে তুমি আরো এমন একটি কাজ করেছ, যে জন্ম, বাবা, আমি তোমার আদরের মেয়ে, তুমি—যাকে আমি—উঃ—

[স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইল]

রাজেশ্বর। কি হয়েছে বল্ মা! চোখের জল পড়ছে? ছিঃ মা! বল্ কি হয়েছে, তোর চোখের জল যে আমি সইতে পারি নে মা!

মমতা। [আত্মসম্বরণ করিয়া] হাঁ আমি বলব। ঐ ঐ ঐ বৃদ্ধা স্থবিরার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি বাবা!—জানো, তুমি ওঁর কি সর্ব্বনাশ করেছ?

রাজেশ্বর। —কে?—মা? হাঃ হাঃ হাঃ! কেন? আমি ওঁর কি করেছি?

মমতা। কি করেছ?—কি কর নি?

রাজেশ্বর। ও বুঝেচি। ওঁর হাতের চরকা কেড়ে নিয়েছি, কেমন? ... এই তো? না, আর কিছু? তা তাতে ওঁর সর্ব্বনাশটা কি হয়েছে শুনি?

মমতা। চিরজীবনের অভ্যাস ছিল ওঁর চরকা-কাটা। ঐ চরকা ছিল ওঁর বাল্যের খেলা, যৌবনের ললিত কলা, বার্দ্ধক্যের সাথী। ও তো শুধু ওঁর চরকা নয়, ও ছিল ওঁর সুখস্বপ্ন সান্ত্বনা! কিন্তু, তুমি, তোমার চাকুরীর খাতিরে, তোমার মনিবের বিরক্তির ভয়ে ওঁর হাত থেকে সেই চরকা কেড়ে নিয়েছ!—কোথায় সেই চরকা? ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও বাবা, ওঁর সেই চরকা। দুটো দিন ওঁকে বেশী বাঁচতে দাও—ওঁর সকল মর্ম্মবেদনা দূর হোক, মুখে হাসি ফুটে উঠুক্ ...

রাজেশ্বর। বটে! ... হুঁ। মা! ... বক্তৃতা তো খুব শোনালি! কিন্তু, তোর দিদিমণির চরকা কাটবার মতো চোখ কি এখনো আছে?

মমতা। এ তো চোখের কথা নয় বাবা! ওঁর কাছে চরকা এখন শুদ্ধ একটা অনুভূতি! হাতের কাছে পেলেই হোল! স্পর্শ করতে পারলেই হোল! ওর সঙ্গে যে তাঁর সহস্র স্মৃতি জড়ানো রয়েছে! ঐ চরকা ওঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ... সরিয়েছ তুমি, কিন্তু, ঐ চরকা ওঁর হাতে আদর করে, আশীর্ব্বাদ করে তুলে দিয়ে ছিলেন—

রাজেশ্বর। আমি জানি। দিয়েছিলেন আমার বাবা। ...আরো ... তোমার কাছে, শুধু তোমার কাছে কেন, হাটে মাঠে শত শত বক্তৃতায় শুনি, কাগজে পড়ি—ঐ চরকা ভারতের লক্ষ্মী, দেশ-মাতৃকার আশীর্ব্বাদ, স্বরাজের চাবী, এবং আরো কত কি! গান্ধীজি বলেছেন, চরকা আমাদের কামধেনু। ... বন্যা?—চরকা কাট। দুর্ভিক্ষ?—চরকা কাট। ধর্ম্মঘটে সুবিধা হচ্ছে না?—চরকা কাট। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা?—চরকা কাট। ম্যালেরিয়া?—কুইনিন নয়, কুইনিন নয় ...

মমতা। হাঁ, চরকা। কুইনিন নয়, চরকা। ... কিন্তু বাবা, সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

রাজেশ্বর। আমারো আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমি চললুম, কিন্তু আজ যে চলেছি, হয় ত আর না-ও ফিরতে পারি! ... মা আমার! মা আমার!

[বিচলিত হইয়া নীরব হইলেন]

মমতা। বাবা!

রাজেশ্বর। দিগ্বিজয়ের কি ফেরবার সময় এখনো হয় নি? কোথায় গেছে জানিস্ মা?

মমতা। [নীরব রহিলেন]

রাজেশ্বর। বল মা! আজ যে আমি চলেছি—আর ফিরব কিনা তাই বা কে জানে! যাবার আগে তাকে কাছে পেলে আমার শেষ উপদেশ তাকে দিয়ে যেতুম, যেদিন হতে তোকে তার হাতে সঁপে দিয়েছি, সেই দিন হতে তোর চাইতে সে আমার কিছু কম নয় মা! বাবা আমার কোথায় গেছে, কখন ফিরবে, যদি জানিস, বল্ মা!

মমতা। বাবা!

রাজেশ্বর। মা!

মমতা। বাবা! [দুই চোখ ছাপাইয়া জল পড়িতে লাগিল]

রাজেশ্বর। সে কি মা! তুই কাঁদছিস!

মমতা।—সে তোমার শত্রু!

রাজেশ্বর। কেন, কেন মা? তোকে কি সে অনাদর করে? হাঁ, তার পাগলামি আছে বটে, কিন্তু—

মমতা। কিন্তু নয় বাবা, না বাবা, সে কথা থাক্।... আর এক পেয়ালা চা দেব? আর কিছু খাবার?

রাজেশ্বর। আমাকে ভুলোতে পারবি নে মা! আমি জানি তার পাগলামি। আজ বুঝি আবার কোনখানে মরা পোড়াতে গেছে? ফিরে এলে বুঝিয়ে বলিস যে, আমাদের শত্রু চার ধারে। তোদের একলাটি ঘরে ফেলে বাইরে পড়ে থাকা কিছু নয়। কেশোরামের ফার্ম্মে তার চাকরির কথাবার্ত্তা চলছিল, তারই বা কি হল?

মমতা। বাবা! হয় চা খাও, না হয়—না হয় কোথায় যাচ্ছ যাও! তার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে বিপদে ফেলো না ... আর এক পেয়ালা চা করে দি, কেমন?

রাজেশ্বর। না মা, আর চা নয়। এক পেয়ালা চা দিয়ে ভোলবার ছেলে আমি নই! কিন্তু না হয় সে কথা এখন না-ই তুললুম। সে যাক্। কিন্তু, দিগ্বিজয় ফিরে এলে' ফোণে আমায় জানিয়ো। তবেই আমি তোদের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে আজ রাত্রে সেই মৃত্যুর দুয়ারে হানা দিতে পার্ব্ব। আমি বাড়ী না ফেরা পর্য্যন্ত তাকে আর কোনখানে যেতে দিয়ো না হাঁ।... আমি আসি। ভয় নেই, ভরা পিস্তল নিয়ে চললুম, হয় আজ তাদের শেষ, না হয় আজ আমার ... না মা, আর আমায় পিছু ডেকো না! [কাত্যায়িনীর দিকে অগ্রসর হইয়া] মাগো! যাবার পূর্ব্বে তোমায় একটা কথা বলে যাই—দায়ে প'ড়েই আমি তোমার হাত থেকে চরকা সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। সে চরকা তুমি আবার হাতে পাবে সেই দিন—[হঠাৎ থামিয়া গিয়া] মমতা-মা, চরকা কাট্‌লে সান্ত্বনা পাওয়া যায় ... সান্ত্বনা পাওয়া যায়, মা?

মমতা। সে কথা কেন বাবা?

রাজেশ্বর। মাগো! আমার প্রণাম নাও। মমতা-মা, সিন্ধুকের এই চাবী নাও—[চাবী নিক্ষেপ] আমি যদি আর না ফিরি ... ঐ চাবী দিয়ে সিন্ধুক খুলে ঐ চরকা আমার মা'র হাতে তুলে দিয়ো ... মা চরকা কাটবেন, তুমি চরকা বেচো।... সান্ত্বনা পাবে! সান্ত্বনা পাবে!

মমতা। বাবা! বাবা!

রাজেশ্বর। হাঁ, আমার মৃত্যুর পর! আমার মৃত্যুর পর। পূর্ব্বে নয়। পূর্ব্বে নয়! [সিঁড়িপথের দিকে অগ্রসর হইলেন]

মমতা। বাবা! বাবা! [পশ্চাতে দৌড়াইয়া গেলেন]

রাজেশ্বর। পিছু ডাকলে অমঙ্গল হয়! [সিঁড়িপথে নামিয়া চলিয়া গেলেন। মমতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ পেছনে হাততালি শুনিলেন, চাহিয়া দেখেন স্থবিরা কাত্যায়নী তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন। মমতা তাঁহার নিকট গেলেন]

কাত্যায়িনী। চলে গেল?

মমতা। হাঁ ঠাকুরমা, চলে গেলেন।

কাত্যায়িনী। —ডাক্ ... ওকে ডাক্—

মমতা। কেন ঠাকুরমা?

কাত্যায়িনী। আমাকে আমার চরকা দিয়ে যাক্।

মমতা। চাবি দিয়ে গেছেন।

কাত্যায়িনী। সিন্ধুক খোল্—

মমতা। ঠাকুরমা!

কাত্যায়িনী। সিন্ধুক খুলে চরকা দে।

মমতা। বাবা এখনো মরেন নি ঠাকুরমা।

কাত্যায়িনী। চরকা! চরকা! চরকা!

মমতা। [উচ্চৈঃস্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে] বাবা এখনো মরেন নি ঠাকুরমা।

কাত্যায়িনী। [উদাসভাবে মমতার মুখের দিকে এক-দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন]

মমতা। চরকা কি এখন চাও? ... এখনি চাও?

কাত্যায়িনী! ওঃ [কম্বলখানি গায়ে টানিয়া একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া হতাশভাবে গা ছাড়িয়া দিলেন]

* * *

[কিয়ৎক্ষণ পরে]

মমতা। ঠাকুরমা!

কাত্যায়িনী। [কোন উত্তর দিলেন না]

মমতা। ঠাকুরমা, শোন।

কাত্যায়িনী। কি দিদি! বল্!

মমতা। আমি তোমাকে একটা চরকা কিনে এনে দি, কেমন?

কাত্যায়িনী। আর কতবার 'না' বলব দিদি?—আমি চাই সেই—সেইটি—যেটি—[থামিয়া গেলেন]

মমতা। আঁধার হ'য়ে এল—

(দিগ্বিজয়ের প্রবেশ)

দিগ্বিজয়। আকাশে মেঘ করেছে … তাই! .. আলো কই? … এ দিকে এসো। [মমতা দিগ্বিজয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইয়া তাহার দিকে এক পা অগ্রসর হইতেই দিগ্বিজয় বারান্দার সুইস্ টিপিলেন—আলো জলিয়া উঠিল, দিগ্বিজয় আবেগাতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন] আলো! আলো! আলো! … [মমতাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিয়া] … এস … শোন … [উভয়ে বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দরজা খোলাই রহিল]

মমতা। কিন্তু, এ কি!

দিগ্বিজয়। কি মমতা?

মমতা। এ তোমার-কি মূর্ত্তি? তোমার চুল আলু থালু, চোখ যেন ঠিক্‌রে বের হ'তে চাচ্ছে! কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে! এ কি! এ কি বিজয়!

দিগ্বিজয়। এ আমার রুদ্র মূর্ত্তি! [পরক্ষণেই, কোমল স্বরে, পরম স্নেহে] তুমি কি ভয় পেয়েছ মমতা?

মমতা। ভয় আমি আজ কিছুতেই পাব না। আমি জানি—আমি বুঝ্‌চি—আমি দেখ্‌চি … হাঁ—[স্বপ্নাবিষ্টার মত] রক্ত! … মৃত্যু … রক্ত! … মৃত্যু!

দিগ্বিজয়। প্রলয়ের বাণী বেজে উঠেছে! হাঁ, প্রলয়! জানি নে তার পর কি! সে যাক্! এক পেয়ালা চা দাও মমতা।

মমতা। [হঠাৎ যেন চৈতন্য লাভ করিয়া] ওঃ [সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ আবৃত করিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দিগ্বিজয় সস্নেহে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন]

দিগ্বিজয়। এক পেয়ালা চা দাও মমতা।

মমতা। [তাহার বুকে মুখ লুকাইয়াই রহিলেন]

দিগ্বিজয়। মমতা!

মমতা। [ক্ষণকাল তদ্রূপ অবস্থাতে নীরবই রহিলেন, পরে সহসা মুখ তুলিলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন] কি?

দিগ্বিজয়। এক পেয়ালা চা!

মমতা। তুমি এসেছ?

দিগ্বিজয়। তুমি ঘুমোচ্ছ?

মমতা। জানি নে। জেগে আছি কি না জানি নে। কিন্তু তোমার এ কি মূর্ত্তি! আমার ভয় করছে! আমার বড়ই ভয় করছে!

দিগ্বিজয়। এক পেয়ালা চা দাও মমতা! দাও শীগ্‌গীর, নইলে—

মমতা। নইলে?

দিগ্বিজয়। নইলে আমাকে মদ খেতে হবে। আজ আমাকে মত্ত মাতাল হ'তে হবে! এক পেয়ালা চা দাও মমতা!

মমতা। তোমার এ কি মূর্ত্তি!—তুমি ব'সো—আমি চা নিয়ে আসচি—কিন্তু—চা খেয়েই আবার বের হ'তে পার্ব্বে না, আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আজ তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে!

দিগ্বিজয়। হবে বই কি!—কিন্তু, তার পূর্ব্বে তোমার হাতের মধু চাই—তুমি নিয়ে এস—আমি দিদিমণিকে দুটো কথা বলে আসি—[দিগ্বিজয় কাত্যায়িনীর কাছে চলিয়া গেলেন। মমতা চা আনিতে গেলেন।

* * *

দিগ্বিজয়। দিদিমণি! [কাত্যায়িনীর হাত দুখানি কম্বলের তল হইতে বাহির করিয়া নিজের হাতের মুঠোর ভিতর নিলেন। কাত্যায়িনী মুখ হইতে কম্বল সরাইয়া দিগ্বিজয়কে দেখিতে পাইলেন]

দিগ্বিজয়। দিদিমণি!

কাত্যায়িনী। বিজয়!

দিগ্বিজয়। বিজয় নয়, দিগ্বিজয়। – হাঁ দিগ্বিজয়! – এ

নাম কে রেখেছিলেন জানি নে, কিন্তু,—হাঁ, আমি দিগ্বিজয় —কেমন আছ তুমি ?

কাত্যায়িনী। [কপালে করাঘাত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

দিগ্বিজয়। [তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে] —আজ রাত্রে প্রলয় হবে, জানো ?

কাত্যায়িনী। [কপালে পুনরায় করাঘাত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং বাহিরে আকাশের দিকে চাহিলেন]

দিগ্বিজয়। প্রলয় হবে, হাঁ, ঠিক্ হবে —প্রলয়! প্রলয়! আমার পঞ্জিকা লিখেছে!—বুঝেচ ? তাই প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার শেষ কথা হোক্! .. শোন— তুমি আমাকে বেশী ভালোবাসো, না তোমার রাজ-রাজেশ্বরকে বেশী ভালবাসো ? উত্তর চাই, এ কথার উত্তর চাই—চাই-ই চাই ··· বল—

কাত্যায়িনী। [কথাটা ঠিক্ ধরিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। দিগ্বিজয়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকা-ইয়াই রহিলেন]

দিগ্বিজয়। কথাটা বুঝ্‌ছ না ?—অর্থাৎ তোমার কাছে তোমার ছেলেই বেশী আদরের, না নাতজামাই— আমিই বেশী আদরের [আবদারের স্বরে] বল, বল দিদিমণি!

কাত্যায়িনী। [কথাটা বুঝিলেন। বুঝিয়া স্মিত মুখে নাতজামাই-এর হাত ছুখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন।]

দিগ্বিজয়। হাঁ—হাঁ—হাঁ। বুঝলুম!

[সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে গান]

আমার মন মজেছে কালোরূপে!
মন মজেছে, মন মজেছে, মন মজেছে,
কালোরূপে!

[হঠাৎ পূর্ব্বের সেই রুদ্র মূর্ত্তিতে] তোমার কিছু মোহর আছে। তুমি তা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ? [দৃঢ় স্বরে] আমি সেই মোহর চাই, আজই চাই, এই রাত্রিতেই চাই ··· না পেলেই চ'লবে না। সেই মোহর কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল ?

কাত্যায়িনী। [দিগ্বিজয়ের এই আবদার এই হাস্য পরিহাস এবং পরক্ষণেই এই অদ্ভুত দাবীতে বিস্মিত, চমকিত এবং বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন]

দিগ্বিজয়। সেই মোহর চাই [বৃদ্ধার হাত ছুটি মুঠোয় পুরিয়া তাহা ঝাঁকিয়া] চাই-ই চাই! ... এখনি চাই। .. কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বল ?

কাত্যায়িনী। মা—গো।—ওঃ—

দিগ্বিজয়। প্রলয়! প্রলয়! প্রলয়!—শীগ্‌গীর বল। না দিলে কিছুতেই ছাড়বো না ... আমি মদ খেয়েছি, আমি মাতাল ... আমি ডাকাত!

কাত্যায়িনী। তোমরা আমার চরকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল—

দিগ্বিজয়। সে তোমার রাজরাজেশ্বরই জানেন। আচ্ছা, না হয় আমি তোমাকে এখনি খুব ভালো একটা চরকা কিনে এনে দিচ্ছি ··· খুব ভালো চরকা! বাজারের সেরা চরকা ... গান্ধী তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছে,—সেই চরকা। খুব ঘুরবে। স্থতো যা কাটে! হাঁ ... সত্যি দেব 'খন, তুমি বল ... লক্ষ্মী মেয়েটির মতো বলে ফেল দেখি। ... কোথায় রেখেছ তোমার সেই মোহর ?

কাত্যায়িনী। আমি আমার চরকা চাই ... সেই! সেই-টি! যে-টি ... [যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন]

দিগ্বিজয়। যে-টি তোমার সেই রাঙা-বর তোমাকে দিয়েছিল, না ? কিন্তু দিদিমণি, চরকা দিয়ে হবে কি ? এই যে সারাটা জীবন রাতদিন চরকা চালিয়ে এলে, তাতে যে কাপড় তৈরী হ'ল তার লাখো গুণ কাপড় তৈরী হচ্ছে একদিনে সাহেবের কলে! বুঝলে ? সেদিন আর নেই! এ যুগে যে চরকা চালাবে, সে তোমারি মতো অথর্ব্ব জড় পদার্থ বন্‌বে, হাঁ! ··· এখন চরকা নয়, চক্র চাই।

কাত্যায়িনী। [কোন উত্তর দিলেন না]

দিগ্বিজয়। ঐ এক জায়গায় তোমার রাজরাজেশ্বরের সঙ্গে দিগ্বিজয়ের মতের অতি আশ্চর্য্য মিল রয়েছে। তিনিও চরকা পছন্দ করেন না, আর আমার তো ও জিনিষটা চক্ষু-

শুল ! ... তা বেশ, তোমার সে চরকটা আমি খুঁজে দেখব এখন। এইবার ভালো-মেয়েটির মতো বল দেখি তোমার মোহরগুলি কোথায় ?

কাত্যায়নী। ঐ চরকাতেই আমার মোহর ! চরকাটা এনে দে—আমায় বাঁচা।

দিগ্বিজয়। ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ ... আবার মেঘ করেছে ! প্রলয় ! প্রলয় ! আজ প্রলয়ের রাত্রি ! ... এককথা, শেষ কথা ... [পুনরায়, সহসা রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া] মোহর কই ? মোহর দাও—

[চা লইয়া মমতার প্রবেশ]

মমতা। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, চা নাও—

দিগ্বিজয়। [মমতাকে দেখিয়াই যেন প্রবল একটা বাধা পাইলেন। মমতার সম্মুখে তাহার সেই দস্যুবৃত্তি যেন নিতান্ত অশোভন হইবে মনে করিয়াই নিজকে সামলাইয়া লইয়া] ... জুড়িয়ে যাচ্ছে ! জুড়িয়ে গেল ! [হঠাৎ] কোথায় চা ? চল ! ... আমি ফিরে আসচি দিদিমণি ... বুঝলে ?

[মমতার অনুসরণ করিয়া উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। এবং মমতা চা ও জল খাবার পরিবেশন করিলে নীরবে তাহা খাইতে লাগিলেন। মমতাই ক্ষণকাল পর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন]

মমতা। মেঘ ?

দিগ্বিজয়। [চমকিয়া উঠিলেন। পরে তাহার চোখে চোখে চাহিয়া] ... হাঁ, মেঘ !

মমতা। আজ আমার একটি অনুরোধ রাখবে ?

দিগ্বিজয়। অনুরোধ ?—চমৎকার !—ভালো, কি অনুরোধ শুনি ?

মমতা। আজ এই মেঘের রাত্রে তোমাকে সারাটি রাত এই ঘরে আবদ্ধ থাকতে হবে, মুহূর্ত্তের জন্য বাড়ীর বাইরে যেতে পার্ব্বে না।

দিগ্বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ ! আজ এই ঝড়ের রাতেই যে আমার অভিসার ! প্রলয়ের বাঁশী বাজছে ! আমি যাব ! আমি যাব !

মমতা। না—না—না !

দিগ্বিজয়। বটে ! এই ঘরে বদ্ধ থেকে আমাকে কি কর্ত্তে হবে শুনি ?

মমতা। আমি গান গাইব, তুমি শুনবে। আমি আমার লেখা পড়ব, তুমি সমালোচনা কর্ব্বে।

দিগ্বিজয়। অনুরোধ কি শুধু একা তুমিই করতে জানো ? আমিও তো তোমাকে আর কোন দিন কোন অনুরোধ করি নি, আজ আমিও তোমাকে আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ জানাচ্ছি—

মমতা। কি ?

দিগ্বিজয়। আমার সঙ্গে বের হতে হবে—

মমতা। সে কি ! কোথায় ?

দিগ্বিজয়। মৃত্যুর খেয়ায় আমরা পাড়ি দেব ... তারপর উদ্বেলিত জীবনের ঘাটে নৌকা বাঁধব। ... আকাশে মেঘ করেছে, ঐ মেঘের অন্ধকারে পথ চলতে হবে, তারপর বিদ্যুৎ ! তারপর বজ্র ! ... আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সেই বজ্র আমাদের সিদ্ধি এনে দেবে ... জয় ! জয় ! জয় ! শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগার হতে দেবকী-বসুদেব উদ্ধার করেছিলেন ... জানো না মমতা, জানো না ?

মমতা। না—না—না ! ওপথে নয় !

দিগ্বিজয়। ঐ পথে, ঐ পথে। অন্য পথ নেই। তুমি চল ... তুমি এস ... তোমার হাত দুখানি বাড়িয়ে দাও ... তোমার হাত দুখানি আমায় ধরতে দাও ... তোমাকে সঙ্গে চাই ... তুমি আমার আলো ... তুমি আমার বিদ্যুৎ, তুমি আমার সাকী ... তুমি আমার সখী ... আমার সাথী ... আমার বন্ধু ... আমার দোসর ! তোমাকে সঙ্গে না পেলে আমার উৎসাহ দমে যায়, প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে আসে, ব্রতভঙ্গ হয় !

মমতা। ওপথে নয় ... ওপথে নয় !

দিগ্বিজয়। ওকথা বহুদিন শুনেছি, আজ আর ওকথা নয়। আর আজ তর্কেরও সময় নেই। তোমার বাবার আসবার সময় হয়েছে, তার পূর্ব্বেই আমাদের পালাতে হবে ...

মমতা। ওপথে নয়, ওপথে নয়, ওগো ওপথে নয় !

দিগ্বিজয়। ঐপথে, ঐপথে। আর পথ নেই, ঐ পথে !

তুমি এস! তুমি চল! তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারছি নে, তুমি এস! তুমি চল! এই আমার হাত ধর—

মমতা। তুমি আমার হাত ধর—

দিগ্বিজয়। ধরলুম।

মমতা। এইবার চল—

দিগ্বিজয়। কোথায়?

মমতা। ছাতে।

দিগ্বিজয়। কেন?

মমতা। আমি তোমায় দেখাব—

দিগ্বিজয়। কি দেখাবে?

মমতা। যা এতদিন দেখেও দেখ নি?

দিগ্বিজয়। হেঁয়ালী রাখ, খুলে বল, কি?

মমতা।—আমাকে।

দিগ্বিজয়। সে কি?

মমতা। হাঁ... আমাকে। আমি মমতা।

দিগ্বিজয়। আবার হেঁয়ালী?

মমতা। না, হেঁয়ালী নয়।... ঐ পাশের বাড়ীর খুকী কাতর হয়ে পড়ে আছে, বাঁচবার আশা নেই! ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।... কিন্তু, তবু?... তার ঘরের ঐ স্তিমিত আলোকে, এইখান হতেই দেখ ... [জানলা খুলিয়া দিলেন] ..কি দেখছ?

দিগ্বিজয়। খুকী শুয়ে আছে। পাশে তার বাবা, আরো কে কে মাথার হাত দিয়ে বসে আছেন ...

মমতা। আর? আর?

দিগ্বিজয়। ও... কে?... হাঁ, আর তার মা ছুটোছুটি করে করে এর-ওর কাছে গিয়ে কি জিজ্ঞেস করেই আবার খুকীর পাশে এসে বসছেন .. এই যে আবার উঠলেন ... ঘড়ি দেখছেন ...। কবে থেকে খুকীর অসুখ হয়েছে?

মমতা। আজ কয়েকদিন।... কিন্তু ... ঐ খুকীর কথাটি ... ঐ খুকীর মা'র কথাটি একটিবার ভেবে দেখ দেখি—খুকী চায় বাঁচতে, তার মা চায় খুকি তার বুক জুড়ে অক্ষয় অমর হয়ে থাক্।... জীবনের আশা নেই, তবু তাদের আকুলি বিকুলির অন্ত নেই ... যুদ্ধ চলেছে ... জানে, হারবে ... তবু ... তবু ... আঁকড়ে ধরে বসে আছে ... কেন ... কিসের জন্য? "মমতা! মমতা!" জীবনের মমতা, পৃথিবীর মমতা, মা'র মমতা, মেয়ের মমতা! এই মমতা ... সংসার ... বিশ্বসংসার ... সার। সৃষ্টির বুক জুড়ে বসে আছে। [থামিয়া] ... দোষ করে থাকি, পাপ করে থাকি, অন্যায় করে থাকি, অবিচার করে থাকি ... পার তো শাস্তি দাও ... তোমার সম্মুখ হতে দূর করে দাও, তাড়িয়ে দাও ... অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান কর ... কিন্তু তাই বলে আমাকে ধ্বংস কর্ব্বে কেন? ... আমাকেও বাঁচতে দাও .. যে আমায় ভালোবাসে, সে আমায় ভালোবাসুক, ভালোবেসে সুখী হোক্, আমি যাকে ভালোবাসি, আমায় তাকে ভালোবাসতে দাও ...! [থামিয়া] ... জয়ই যদি চাও ... আমার চিন্তাধারা, আমার মনোবৃত্তি জয় কর ... সেই জয়ই জয় ... আমাকে গুলি করে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিয়ে জয়লাভ করা—জয়লাভ নয় ... তা কাপুরুষতা ...

দিগ্বিজয়। কাপুরুষতা?

মমতা। হাঁ, কাপুরুষতা। সাম্য নয়, মৈত্রী নয়।—কাপুরুষতা।

দিগ্বিজয়। কাপুরুষতার তবে আর এক নতুন ব্যাখ্যা পেলুম। সর্দ্দার বলেছিলেন তোমার দিদিমণির সোনার মোহর যদি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে আজ বের হতে পার তবেই বুঝব, হাঁ, মনের জোর আছে বটে। প্রথমে বলেছিলুম পারব না। সে তো আমার দিদিমণি নয়, তিনি আমার মা ... শৈশব হতে তিনিই আমাকে ছেলের মত প্রতিপালন করে এসেছেন। উত্তর হ'ল—"কাপুরুষ!" ... সে যাক্, ব্যাখ্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখছি নে।

মমতা। বটে! তাই মোহর মোহর করে চেঁচামিচি করছিলে?

দিগ্বিজয়। করছিলুম। সে মোহর আমার চাই, চাই-ই চাই, আজ রাত্রেই চাই, এখনি চাই, কিন্তু, সে কথাও যাক্। তুমি যাবে না?

মমতা। না।

দিগ্বিজয়। কেন কারণ শুনতে পারি কি?

মমতা। আমার পিতার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। মায়ের অভাবে তিনি নিজে আমাকে মায়ের স্নেহে প্রতিপালন করেছেন! তোমাকেও—

দিগ্বিজয়। তোমাকে লালনপালন করে তিনি কেবল তাঁর কর্ত্তব্যপালন করেছেন! নইলে জন্মদান করা তো অতি সহজ!

মমতা। এইবার আমি আমার কর্ত্তব্যপালন কর্ব্ব।

দিগ্বিজয়। কার প্রতি? পিতার প্রতি, না স্বামীর প্রতি?

মমতা। [নীরব রহিলেন]

দিগ্বিজয়। তিনি তোমার পিতা; কিন্তু আমি কি কেউই নই?

মমতা। তাঁর কৃপায় দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছি, তার পরই ত তোমাকে পেয়েছি, পেয়ে ভালবেসেছি! ভালোবেসে সুখী হতে পেরেছি!

দিগ্বিজয়। বটে!

মমতা। [ভক্তি-বিহ্বলভাবে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া] "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমংতপঃ"

দিগ্বিজয়। বটে! স্বর্গ মানো?

মমতা। আমি মানি তুমি না মানতে পারো, আমি মানি।

দিগ্বিজয়। আমিও মানি। বেশ। কিন্তু, শোন তোমার পিতা তোমার আত্মাকে সেই স্বর্গ হইতে মর্ত্তে টেনে নিয়ে এসেছেন।

মমতা। এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

দিগ্বিজয়। যেই বলুক, যদি স্বর্গ মানো, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু—অধঃপতিত আমরা আবার সেই স্বর্গের পথে চলেছি—"দেবী আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!"

মমতা। বৃথা তর্ক। তবে শোন তুমি! বাবা বের হয়ে গেছেন—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বের হ'য়ে গেছেন! তুমি চুরী করে, তোমার প্রতি তাঁর অকপট বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, আমার স্বামীত্বের সুবিধা নিয়ে, পূর্ব্ব হতেই তাঁর কাগজপত্র, নক্সা তাঁর গোপনীয় সকল চুরি করে দেখে নিয়ে তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করেছ, তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বিপন্ন করেছ, তাঁকে তাঁর মুনিবের কাছে অপদস্থ করেছ; কিন্তু, আজ হয় তিনি তাঁর জয় অর্জ্জন করে তাঁর জীবিকাসংস্থানের পথ নিষ্কণ্টক কর্ব্বেন, না হয় মৃত্যুবরণ করে অপমান আর দারিদ্র্যের হাত হতে মুক্তি নেবেন। আজ তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আজ হয় তোমাদের শেষ, না হয় তাঁর শেষ—

দিগ্বিজয়। তবে তিনি আজও সন্ধান পেয়েছেন?

মমতা। পেয়েছেন। এবং আজ তিনি দুর্নিবার।

দিগ্বিজয়। [টেবিলে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া] অসম্ভব! তাঁকে বাধা দিতেই হবে!

মমতা। অসম্ভব!

দিগ্বিজয়। [উঠিয়া] আমি চললুম। কিন্তু শোন মমতা তোমাকেও যেতে হবে যদি আমার মঙ্গল চাও, যদি আমার জয় চাও, যদি আমার প্রতিষ্ঠা চাও, তবে তোমাকে যেতেই হবে। আর যদি না যাও, তবে তুমিই হবে আমার প্রথম ও প্রধান শত্রু। আমি শক্তি চাই—শক্তি চাই—আর আমার সে শক্তি তুমি!

মমতা। ওপথ নয়, ওপথ নয়! আমাদের পথ মরুভূমির মাঝ দিয়ে! হাতে আলো নাও, চোখে জল আনো, বুক স্নেহে ভরে উঠুক!

দিগ্বিজয়।—দয়া কর, দয়া কর তুমি!

মমতা। দয়া কেন? ভালোবাসি, ভালোবাসবো!

দিগ্বিজয়। ভালোবাসো?—কখন্?

মমতা। যখন দ্বিপ্রহর রাত্রেও তুমি ঘুমুতে পার না, প্রহরের পর প্রহর চলে যায়, ঘুম আসে না, তুমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর, বেদনায় আর্ত্তনাদ করে ওঠ, তন্দ্রামধ্যে বিভীষিকা দেখে চীৎকার করে ওঠ, তখন! যখন তোমার ঐ রুদ্রমূর্ত্তি, অসুখে, ঐ বাড়ীর ঐ খুকীর মত জীর্ণ, ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে, তখন! যখন তোমার চোখে ঘুম এনে দি তখন!

দিগ্বিজয়। [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] তুমি যাদুকরী! তুমি মায়া! তাই তুমি মমতা! তুমি আমার মোহ! তোমাকে কাটাতে হবে! হাঁ, হবে। নইলে মুক্তি নেই,

মুক্তি নেই! বেশ, তুমি থাক, আমি একলাই চল্লুম! বিদায়!

[প্রস্থানোদ্যত। মমতা তাহাকে বাধা দিলেন]

মমতা।—দাঁড়াও।

দিগ্বিজয়। আমার মুহূর্ত্তের অবসর নেই। এই মুহূর্ত্তে আমাকে আমার কারখানায় ছুটতে হবে। আমাদের জীবনের সাধনাকে ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে—না—উঃ, কিছুতেই না!

মমতা। স্বামী! প্রিয়তম!

দিগ্বিজয়। না—না—না—

মমতা। মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে এক অমূল্য অস্ত্র উপহার দিচ্ছি—[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

দিগ্বিজয়। বেশ, এই সুযোগে আমিও টেলিফোনে একটা জাল পাতি! [টেলিফোন ধরিলেন] Hullo! পলাশতলা, yes, রাজেশ্বরবাবু ইনস্পেক্টারকে শিগ্‌গীর খবর দিন—তাঁর বাড়ীতে আগুন লেগেছে, শিগ্‌গীর চলে আসুন, সব শেষ হয়ে গেল, হাঁ, yes, thanks!

[পিস্তল হস্তে ছুটিয়া মমতার প্রবেশ]

মমতা। ও কি সর্ব্বনাশ করলে তুমি?

দিগ্বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ! দুর্নিবার! দুর্নিবার! আজ আমিও দুর্নিবার!

মমতা। বিজয়! বিজয়!

দিগ্বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ! একটা জাল পাতলুম, ও জালে তাঁকে পড়তেই হবে, রাজেশ্বরই হোন আর রাজ-রাজেশ্বরই হোন ... হয় ত সব বেঁচে যাব, কিন্তু শুধু ওর ওপর নির্ভর করে থাকতে পার্চ্ছি নে। বাঃ পিস্তল এনেছ দেখছি!—উদ্দেশ্য?

মমতা। তোমার পরীক্ষা।

দিগ্বিজয়। কিরূপ, শুনি!

মমতা। তোমাকে আমি বাইরে যেতে দেব না!

দিগ্বিজয়। এতদূর?

মমতা। হাঁ, এতদূর!

দিগ্বিজয়। [দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন] বটে!

মমতা। হাঁ। এই নাও পিস্তল—[ধীর ভাবে টেবিলের উপর পিস্তল রাখিয়া দিলেন]

দিগ্বিজয়। [তন্মুহূর্ত্তে পিস্তলটি তুলিয়া লইয়া] এইবার?

মমতা। এইবার যেতে হয়, আমাকে বধ করে আমার মৃত দেহের উপর দিয়ে পথ করে যাও—

[দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইলেন]

দিগ্বিজয়। উঃ এতদূর! এতদূর! [সহসা] যদি তোমাকে ঠেলে ফেলে যাই—

মমতা। আমি তখনি উঠে টেলিফোনে খবর দেব আগুনের কথা মিথ্যা ··· বাবাকে আসতে হবে না—

দিগ্বিজয়। [দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সহসা] যদি তোমাকে বেঁধে রেখে যাই?

মমতা। তাঁরা ফিরে এলেই সব কথা খুলে বলব তাঁরা আবার তোমাদের পেছনে পেছনে ছুটবেন!

দিগ্বিজয়। যদি তোমাকে—যদি তোমাকে—[মমতাকে লইয়া যে কি করিবেন তাহা কিছুতেই ঠিক্ করিতে পারিতে-ছিলেন না। শেষে অনন্যোপায় হইয়া] হাঁ, আমি যাব। [বজ্রমুষ্টিতে পিস্তল ধরিলেন] দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও—

মমতা। সোজা হয়েই দাঁড়িয়েছি!

দিগ্বিজয়। মমতা! মমতা! শেষে তোমাকেই?

মমতা। তোমার সময় বয়ে যাচ্ছে!

দিগ্বিজয়। তোমার পায়ে পড়ি মমতা!

মমতা। তাঁদের আসবার সময় হয়ে এল!

দিগ্বিজয়। [চমকিয়া উঠিলেন] ঠিক্। ... প্রস্তুত!

মমতা। প্রস্তুত। গুলি কর।

দিগ্বিজয়। [পিস্তল লক্ষ্য করিলেন, কাঁপিতে লাগি-লেন, কপালের ঘাম মুছিয়া আবার লক্ষ্য করিলেন, শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে পিস্তল ফেলিয়া দিয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িলেন]

মমতা। পালে না! এই তোমার নিষ্ঠা! ... বুঝলে এইবার, মমতা কত বড়? মমতাতেই মানুষের জন্ম। মায়ের বুক হতে মমতার দুধ ঝরে পড়ে, আমরা তাই খেয়ে মানুষ। যে দেশে তুমি জন্মেছ এ মমতার দেশ! এর মাটিতে মমতার রস, গাছে মমতার ফুল, নদীতে মমতার ধারা, পাহাড়ে মমতার ঝরণা, এ বন্দুকের দেশ নয়, বোমার দেশ নয়।

দিগ্বিজয়। ওঃ [আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন]

* * *

[নিম্নে সদর দরজায় করাঘাত হইতে লাগিল]

দিগ্বিজয়। ও—হো—হো! সব ব্যর্থ হ'ল!

[আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন]

মমতা। দেখি, কে এল। কিন্তু, তোমাকে শিকল দিয়ে রেখে যেতে হবে। [পিস্তল লইয়া বাহির হইয়া দরজায় শিকল বন্ধ করিয়া সিঁড়ি-পথে নীচে নামিতেই রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সহিত দেখা হইল]

রাজেশ্বর। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? আগুন কই? আগুন কোথায়?

মমতা। আগুন নিভে গেছে! আগুন নয় বাবা!

রাজেশ্বর। তবে টেলিফোনে খবর পেলুম—

মমতা। সে খবর আমি দেই নি।

রাজেশ্বর। তবে কে দিয়েছিল?

মমতা। আপনার "মেঘনাদ রায়।"

রাজেশ্বর। [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] "মেঘনাদ" "মেঘনাদ" ... কোথায় সে?

মমতা। এই শিকল বন্ধ ঘরে।

রাজেশ্বর। বটে! খোল শিকল—[বংশীতে ফুৎকার। দুপদাপ করিয়া কয়েকজন কনষ্টবল উপরে উঠিয়া আসিল] খোল শিকল—রিভলভার! আমার রিভলভার! [পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া দরজার দিকে বাগাইয়া ধরিয়া রহিলেন]

মমতা। বাবা! বাবা! [রাজেশ্বরের বুকে লুটাইয়া পড়িলেন]

রাজেশ্বর। কোন ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই। দিগ্বিজয় বুঝি এখনো আসে নি? [কনষ্টবলের প্রতি পুনরায়] শিকলটা এখনো খুলতে পালে না?

কনষ্টবল। শিকল খুলেছি, কিন্তু, দোর ভেতর হতে বন্ধ!

রাজেশ্বর। সর তো মা! [মমতাকে সরাইয়া দিয়া দরজাতে ধাক্কা দিলেন। কিন্তু, দরজা খুলিল না]—এ কি! ভেতর হতেই তো বন্ধ! সে দোরে খিল দিয়েছে মমতা!

মমতা। বাবা! বাবা! তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

রাজেশ্বর। সে কি মা! ভয় নেই তোর। তুই তোর দিদিমণির কাছে যা। দরজা ভাঙো তোমরা, ভাঙো—

মমতা। দরজা ভেঙো না। সে এতদিন লুকিয়ে ছিল, এখনো লুকিয়ে আছে, তাকে কোনদিন দেখ নি, আজো না-ই দেখ্‌লে—বাবা! বাবা! আমার কথা রাখ!

রাজেশ্বর। তুই আমার কথা রাখ্‌ মা, তুই মা'র কাছে যা—

কয়েকজন কনষ্টবল। আগুন! আগুন! ভেতরে আগুন! ঐ যে ধোঁয়া ...

আর কয়েকজন কনষ্টবল। সর্ব্বনাশ! ঐ জানলায় ধরেছে, ঐ দরজায় ধরল!

রাজেশ্বর। ভেতরের ডাকাতই আগুন দিয়েছে! সর্ব্বনাশ হ'ল সর্ব্বনাশ হ'ল! দম-কলে খবর দাও—[একজন কনষ্টবল ছুটিয়া নামিয়া গেল] মমতা! মমতা! এই ঘরে যে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুকানো রয়েছে!

মমতা। সত্য কথা! বাবা, তোমারও সর্ব্বস্ব, আমারও সর্ব্বস্ব ঐ ঘরে! [উন্মাদিনীর মত] দরজা ভাঙো বাবা!

রাজেশ্বর। [উন্মত্তের মত দরজাতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন] না মা! আর পারি নে, দরজাতেও আগুন লেগেছে, লোকটা শেষে পালাবার পথ না পেয়ে আগুনে পুড়ে মরে বেঁচে গেল!

মমতা। বাবা-গো ওঃ! [মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন]

রাজেশ্বর। [হেড কনষ্টবলের প্রতি] দরজা ভাঙ, আমি আমার মেয়েকে নিয়ে মা'র ঘরে চললুম—[মূর্চ্ছিতা মমতাকে লইয়া কাত্যায়িনীর কাছে আসিলেন। হেড কনষ্টবল দরজাতে প্রাণপণে পদাঘাত করিতে করিতে দরজা ভাঙিয়া গেল, এবং এক ঝলক ধোঁয়া ও আগুন বাহির হইয়া আসিল]

কনষ্টবলগণ। দরজা ভেঙেছে! দরজা ভেঙেছে!

রাজেশ্বর। আমি আসছি, সিন্ধুকের চাবী নিয়ে আসছি, [মমতার আঁচল হইতে চাবীর রিং লইয়া ছুটিয়া অগ্নি-সমাচ্ছন্ন ঘরে ঢুকিলেন]

* * *

[আগুনে, ধূমে চীৎকারে এবং আর্ত্তনাদে মনে হইল এ বুঝি খণ্ডপ্রলয়। ক্রমে কোলাহল কমিয়া গেল]

রাজেশ্বর। [সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন, হাতে ছিল একটি চরকা] মমতা! মমতা! মা! মা!

মমতা। [চেতনা পাইয়া] বাবা! বাবা!

কাত্যায়িনী। [এতক্ষণ জড়পদার্থের মতো নির্ব্বিকার-চিত্তে সব দেখিতেছিলেন, চরকা দেখিয়াই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] চরকা! চরকা! আমার চরকা!

রাজেশ্বর। [দুই পা যাইতেই পড়িয়া গেলেন, আবার উঠিলেন, এবার কাত্যায়িনীর চৌকীর উপর আছড়াইয়া পড়িলেন] এই নাও মা, তোমার চরকা! আমি চুরী করেছিলুম। আমার অভাবে তোমাদের কি হবে তাই ভেবে চুরী করেছিলুম! ঐ চরকার মধ্যে একটি গুপ্তডালা আছে, স্প্রিং-এ টান দিলেই তা খুলে যাবে ... মমতা-মা, ডালা খুল্‌লেই একশ মোহর পাবে। ও মোহর আমার বাবা তোর দিদিমণিকে চরকাশুদ্ধ যৌতুক দিয়েছিলেন।

কাত্যায়িনী। চরকা! চরকা! আমার সোনার চরকা!

[চরকাটা টানিয়া লইয়া গুপ্তডালা খুলিয়া ফেলিলেন, এবং মোহরগুলি বাহির করিয়া "সোনার চরকা, আমার সোনার চরকা" বলিয়া বলিয়া মোহরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন]

রাজেশ্বর। ছড়িয়ো না, ছড়িয়ো না মা! মোহর ছড়িয়ো না! ঐ ভয়েই আমি তোমার হাত হ'তে ও চরকা কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলুম! মমতা-মা, মোহরগুলি তুলে রাখ, আমি আর বাঁচব না! আর বাঁচলুম না! ওঃ [যন্ত্রণায় আকুলি বিকুলি করিয়া] ঐ মোহর দিগ্বিজয়ের হাতে দিস্, তোদের আর কোন অভাব হবে না! আমি নিশ্চিন্তে মর্ত্তে পারব!

মমতা। দিগ্বিজয়! বিজয়! ও-হো-হো! বাবা! বাবা! মেঘনাদের খবর কি বাবা?

রাজেশ্বর। ত'র শাস্তি ভগবান দিয়েছেন! তাকে আর চেনবারও উপায় নেই! কিন্তু ওঃ, যাই, জ্বলে যাচ্ছে! পুড়ে যাচ্ছে।

মমতা। বাবা! এই আমার শাঁখা নাও—

[শাঁখা ভাঙিয়া ফেলিলেন]

কাত্যায়িনী। তুই আমার এই চরকা নে দিদি!

রাজেশ্বর। মমতা-মা, তবে কি ... তবে কি?

[কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন]

——যবনিকা——

কার্ত্তিক সংখ্যার কল্লোলে শুধু গল্প থাকিবে। ধারাবাহিক উপন্যাস, প্রবন্ধ বা কবিতা থাকিবে না।

ব্যথিত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

১

আমার জীবন মোরে সস্নেহে দিয়েছে উপহার
একখানি শুভ্র-শুচি ব্যথা—শান্ত স্নিগ্ধ, সুকোমল
সন্ধ্যার প্রথম তারা সম ; নিশীথের অশ্রুজল
অভিষিক্ত করি' তা'রে জানায় চরম নমস্কার।

মোর জীবনের কাছে এর বেশি করি নি প্রার্থনা,
পাই নাই কিছু ; অন্যমনে কভু অন্য কোনো আশা
করি নাই ; চিররিক্ত অন্তরের অন্তিম তিয়াষা—
ক্ষণে ক্ষণে বক্ষঃতলে বিকম্পিত, বিনিদ্র বেদনা।

জানি আমি যে নন্দন রচেছিনু ধ্যানের স্বপনে,
সত্য হ'য়ে দেখা দিবে না সে ; প্রিয়ার আঁখির আলো,
বন্ধুর মধুর প্রেম, স্নেহ-স্নাত শান্ত গৃহকোণে
তপঃ ক্লেশে ; এই স্বপ্ন-স্বর্গ আজি আঁধারে মিলালো।
তবুও জীবন মোরে এই ব্যথাখানি দিল বলে'
নমস্কার করি তা'রে মোর রজনীর অশ্রুজলে।

২

এই ব্যথাখানি মোর দুই চক্ষে মায়ার অঞ্জন
দিয়েছে পরায়ে ; নির্নিমেষ হেরিয়াছি অপরূপ
বিশ্ব-সৃষ্টি ; রক্তিম, বঙ্কিম অগ্নি, জ্বলন্ত, ভীষণ—
তাহে আমি হেরিয়াছি প্রিয়া-মুখচ্ছবি, কত রূপ

কত ছন্দ, কত বর্ণ হিল্লোলিত করে ধরণীরে
সর্ব্ব ঋতুকালে পলে-পলে—তাহা জেনেছি সহসা
যেমনি ব্যথায় দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়েছে আঁখি-নীরে।
তখন পেয়েছি আমি সান্ত্বনার অমৃত-বরষা

প্রখর রৌদ্রের দাহে ; বিক্ষিপ্ত ধূলির ক্ষিপ্রবেগে
রচিয়াছি স্বপ্ন-জাল ; সংসারের সঙ্কীর্ণ কলহে
শুনেছি ছন্দের সুর ; মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ জেগে
একটি নিঃসঙ্গ তারা, দেখিয়াছি, কাঁপিছে আগ্রহে,
আপনার দীপ্তি দিয়া দগ্ধ করি' আপন অন্তর :—
তখন বুঝেছি প্রাণে, কেন ধরা এমন সুন্দর।

৩

এই ব্যথাখানি যদি কভু নাহি তরঙ্গিত আসি'
জীবনের সমুদ্রে আমার, তবে মোর যশঃপ্রভা
হয়-তো তাদেরি মুখে গর্ব্ব-দীপ্তি তুলিত উদ্ভাসি'
আজ যারা হেয়জ্ঞানে মোরে তুচ্ছ করে ; হয় তো বা

পারিতাম সুখী হ'তে ; হয় তো মিলিত অবসর
সঞ্চয়ের ; কার্পণ্যের জুটিত উৎসাহ ; প্রশংসার
পড়ি' যেত ছড়াছড়ি ; রসনা-প্রভুর তুষ্টিকর
আহার্য্যে দেহের পুষ্টি বৃদ্ধি পেত ; রহিত না আর
রুগ্নদেহে, ভগ্নমনে বাসনার অসংখ্য বিকার।

হয়-তো সকলি ভালো হ'ত। তবু আজ ভাবি যবে,
কী মহান্ মহিমায় ব্যাপ্ত হ'য়ে আছি নিশিদিন,
বক্ষের রক্তের তালে কী মত্ততা স্পন্দিছে নীরবে,
ব্যথার পাথার-মাঝে কোন্ দেব পদ্ম-সমাসীন—
ধন্য মানি আপনারে, ছিনু বলে' ব্যথায় বিলীন।

৪

মোর জীবনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহারখানি
চিরাবগুণ্ঠিত মোর অন্তরের অন্তর-পুরীতে

কোন্ এক পুণ্য ক্ষণে আনি দিলো যে-মুগ্ধা কল্যাণী
কঙ্কন ঝঙ্কৃত দুই কল্যাণ-করের অঞ্জলিতে

সযত্ন-সজ্জিত নব-পত্রপুটে বহি' অর্ঘ্য-সম
উৎসৃষ্ট ব্যথার ডালি ; ক্ষণিকের স্নিগ্ধ হাসি হেসে,
একবার দেখা দিয়ে আজন্মের প্রেয়সীর বেশে
যে-নারী ভুলালো ; আজ বারম্বার তা'রে নমোনমঃ।

কাছে এসে যে-মোহিনী চলি' গেলো ধরা নাহি দিয়ে,
যে মানসী স্বপ্ন হ'তে আসিল না নামি' এ ভুবনে,
সে মোর বাসনারাশি গেছে চলি' চুরি করি' নিয়ে ;

বিনিময়ে দিয়ে গেছে বেদনার ধারা মোর মনে
প্রবাহিত করি' ; শুভশুভ্র গঙ্গাধারা লভিলাম
তাহার নিজের হাত হ'তে ; তাই তাহাকে প্রণাম।

স্বপ্নের বিড়ম্বনা

শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র

সরোজনাথ আহারে বসিয়াছেন, স্ত্রী বিনোদিনী তাহাই লক্ষ্য করিতেছেন। সরোজনাথের একটু দুর্ব্বলতা ছিল—ভোজনের আনন্দে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের চিন্তা করিতেন। আজও করিতেছিলেন—

—ও হরি, ও হরি!
ভজন সাধন কখন্ করি।

স্বামীর তৃপ্তিতে বিনোদিনীরও তৃপ্তির শেষ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সরোজনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কি যেন একটা স্মরণ করিয়া দুধের বাটিটা তিনি মুখ হইতে নামাইয়া রাখিলেন। স্বামীর গম্ভীর মুখ কদাচিৎ চোখে পড়ে; তাই বিনোদিনীর উদ্বেগের সীমা রহিল না। ঘন-দুগ্ধে বৈরাগ্য সরোজনাথের—আশ্চর্য্য!

—কি হল, দুধটা নামিয়ে রাখ্‌লে যে?

—ইয়ে দুধ না ছাই! খেতে পারব না যাও—টক্ থুঃ।

সরোজনাথ মুখ এতবড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বিনোদিনী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—দুধ আমি নিজে জ্বাল দিলুম, খারাপ হল?

—তোমাদের ঐ এক কথা, হাঁ। ইয়ে খারাপই যদি না হল ত টক্ হল কেমন করে, আর টকই যদি হল ত খারাপ হবে না কেন? যেমন ইয়ে সব বুদ্ধি!

তবুও বিনোদিনীর মোটা বুদ্ধি সরু হইল না। তাঁহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। রাগের কারণটা কি? বিশেষ করিয়া আহারের উপর রোষ—ইহা বড় সাংঘাতিক।

বিনোদিনী আহারাদি সারিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলেন, সরোজনাথ পুত্র বংশীকে লইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। বোধ হয় ঘুমাইয়াও পড়িয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার নাসিকাও যে এমন নিঃশব্দে ঘুমাইয়া পড়িবে, ইহা বড় বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে বোধ করি স্বামী জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। বিনোদিনী একটু হাসিয়া খাটের কাছে

সরিয়া আসিয়া কহিলেন—ওগো ঘুমুলে না কি? বংশী কি তোমার কাছেই আজ শোবে?

কোন উত্তর মিলিল না, কেবল সরোজনাথ একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বিনোদিনীর হাসি চাপা দায় হইয়া পড়িল।

—শুন্‌চ, শরীরটা কি আজ তোমার ভাল নেই?

—না।

—ও, জেগে আছ তাহলে, আমি বলি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।

—ইয়ে জেগে আছি কে বল্‌লে শুনি?

বিনোদিনী হাসিয়া ফেলিলেন, স্বামী যে জাগিয়া আছেন এ কথা ত সত্যই কেউ বলে নাই!

তবে কথা বলছ যে?

—মশা কামড়ালে ইয়ে বুঝি চুপ করে থাকা যায়?

বিনোদিনী হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্বামীর অভিমানের নিদর্শন ঐটুকুই—রাগিলে মশারির কোণ্ কিছুতেই গুঁজিবেন না, ঘন দুগ্ধকে তিক্ত বলিবেন, আর জাগিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিবেন। শিশুপুত্র বংশীটাও রাগিলে অনর্থ বাধাইয়া বসে।

—রাগের কারণটা কি শুনি?

—ইয়ে বয়ে গেছে বল্‌তে। নিজের যে রাত্তিরে ঘুম হয় না, শরীর ভাল নেই, আমার যে ডাক্তার দেখানো উচিত, খাচ্ছ কি না খাচ্চ দেখা উচিত, ইয়ে এ সব বলে দেবে না, আবার রাগ করিচি কেন! বয়ে গেছে ইয়ে বল্‌তে—যাও!

বলিয়া সরোজনাথ পাশ ফিরিলেন; তারপর একটু উত্তেজনায় বসিয়া বলিলেন—আবার ক্ষীর খাও, হেন খাও, তেন খাও। আচ্ছা নিজে যে রোগা হয়ে যাচ্ছেন, সে কথা বল্‌তেও কি ইয়ে হয়েছিল শুনি? কাল থেকে আমিও কিছু খাব না! দাঁড়াও-ত!

বলিয়া সরোজনাথ সেই যে শুইয়া পড়িলেন, আর কথা বলিলেন না, নড়িলেনও না। সত্যই রাগ কাহার না হয়—বিনোদিনী যে রোগা হইয়া যাইতেছেন, কেন তিনি তাহা তাহাকে বলিয়া দেন নাই!

সরোজনাথের পরিচয় ঐটুকুই। এ ছাড়া সমবয়স্কদের কথা ত দূরে থাক্, ক্ষুদ্র যুবার সাথেও প্রৌঢ় সরোজনাথ মিশিতে পারিতেন না। বংশী প্রভৃতি শিশুদের সাথে তিনি মহানন্দে আড্ডা জমাইতেন। লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাদের সহিত পুতুলও খেলিতেন হয় ত।

অথচ এই সরোজনাথ আজ দশ বৎসর হইল আইন পাশ করিয়া ওকালতি করিতেছে। প্রতিবেশী দিনু খুড়ো সকা'ল বেলায় রাস্তার ধা'রের রোয়াকে বসিয়া যত রাজ্যের "ভাই করালি, দাদা কৃতান্ত" জুটাইয়া দমভোর কাশিতে কাশিতে ঊর্দ্ধপানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিতেন—হেঁ হেঁ উকিল ও উকিল, মক্কেল ও লবডঙ্কা, পাগলা বই ত নয়।

দিনু খুড়োর উষ্ণতার কারণ হয় ত ছিল। কেননা তাঁহার কাঠের দোকানের দেনদারদের কোন নোটিশ দিবার প্রয়োজনে যখনই তিনি সরোজনাথের দস্তখত লইতে আসিয়াছেন, সরোজনাথ কানে পেন্সিল গুঁজিয়া বিস্তর নথীপত্র লইয়া আসিয়া মুখবিকৃত করিয়া বলিতেন—ইয়ে দেখ দিনু, একটা জরুরী মামলা, বুঝলে না, ইয়ে একবার বিকেলবেলা আস্‌তে পারবে না দিনু?

অথচ ভিতরে গিয়া দেখ দেখিবে, সরোজনাথ হয় ত বংশীর সহিত খুনশুটি করিতেছেন কিংবা পেয়ারা ডাল চাঁচিয়া পুত্রের ছিপটি বানাইয়া দিতেছেন; আর মনে মনে বকিতেছেন—ইয়ে গেল যাক, নব্‌নের কাছে যাক। জরুরী মামলা না হয় আজই নেই; কিন্তু কালপরশু আস্‌তে কতক্ষণ, ইয়ে আগে থাক্‌তে একটু ভেবে রাখ্‌তে হবে ত, সময় কই? তা যাক্, নব্‌নে ছোঁড়া যখন ভুল করে দস্তখত করবে তখন বুঝ্‌বে 'খন ইয়ে ...

সরোজনাথ দাসীকে হাঁক দিয়া কহিলেন—মানদা, ইয়ে দিনুকে একবার ডেকে আন্ ত মা।

কিন্তু দিনু আসিল না।

প্রতিবেশী নবীনের উপর সরোজনাথ তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না; কারণ প্রথমত উকিল-হিসাবে সে মন্দ ছিল না, দ্বিতীয়ত উকিল-মহলে সে-ই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্যক্ত করিত। আদালতে সকলে তাঁহাকে পাগ্‌লা-দা

বলিত। সে-দিন নবীন মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—আচ্ছা, পাগ্‌লা-দা, যখন আপনার হাতে বৌদিকে সম্প্রদান করা হচ্ছিল, তখন কি একটা ঝপাং করে শব্দ হয়েছিল কোথাও?

—ইয়ে কই না ত।

—নয় কি, নিশ্চয়ই হয়েছিল।

সকলে উদগ্রীব হইয়া শুনিতেছিলেন। নবীন হাসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বলিল—এটা আর বুঝলে না হে তোমরা, দাদার হাতে কন্যা সম্প্রদান করা আর জলে ছুঁড়ে ফেলা সে একই কথা।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া সরোজনাথও হাসিয়া ফেলিলেন।

* * *

প্রথম যখন বিনোদিনী বধূরূপে এ বাড়ীতে পদার্পণ করেন তখন শ্বশুর চন্দ্রনাথ বাঁচিয়া ছিলেন। তিনিও ওকালতি করিতেন। তখনকার দিনের সরোজনাথের অনেক ছেলেমানুষি আজ বিনোদিনীর মনে পড়ায় তাঁহার চোখে জল আসিতেছিল।

সরোজনাথের একটু বেশী রকম চা খাওয়ার অভ্যাস—তিনি অন্য কোন নেশা করিতেন না। সুতরাং সংসারে যে দু বেলা চা হইত তা সত্ত্বেও অনেক সময় বিনোদিনীকে ঘরে ষ্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া দিতে হইত। স্বামীর এই অভ্যাস কমাইবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি দুষ্টামি করিয়া ষ্টোভ জ্বালিতে চাহিতেন না। বাহিরে শ্বশুর মক্কেল মুহুরি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। সরোজনাথ সেখানে গিয়াই নালিশ করিয়া বলিতেন—বাবা, ইয়ে দেখ না, চা করতে বল্‌চি শুনচে না।

চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াও হাসিয়া বলিতেন—কে রে, উড়ে ঠাকুর বুঝি!

—না না সে কেন?

—তবে বীণা বুঝি, চ বীণাকে বলে দি—বীণা!

বীণা সরোজনাথের ভগিনী।

—হুঁ, বীণা বই কি!

বাহিরে দরজার কাছ হইতে মলের ঝুনুঝুন আওয়াজ আর চাপা হাসি আসিত।—ও, বৌমা বুঝি, হ্যাঁগা বৌমা···

বাইশ বৎসরের যুবক সরোজনাথ কচি ছেলের মত আব্দারের সুরে কহিত—হেঁ হেঁ দেখ্‌লে ইয়ে··· বধূ তখন মুখে কাপড় চাপা দিয়া মলের ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ করিতে করিতে পলায়মান।

এমন কত খেলাই হইয়া গিয়াছে। সরোজনাথকে বোধ হয় পিতা চন্দ্রনাথই একমাত্র চিনিতেন, মাতা নবীন-কালীও নয়। তাহার প্রমাণ, না বুঝিয়া সুঝিয়া কেন তিনি ঐ ভীতু মানুষটির অনর্থক এমন উদ্বেগ বাড়াইতে গেলেন? কালই হয় ত সরোজনাথ ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিয়া একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন।

পরদিন সকালে বিনোদিনী শাশুড়ীকে গিয়া বলিল—মা, তুমি ত জান, উনি কি ভয়ানক ভীতু মনিষ্যি, ওসব কথা কেন বলতে গেলে মা?

—কি কথা বিনোদ?

—ঐ যে আমার শরীর খারাপ হয়েছে, কিছু খেতে পারি না এ সব। কই আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না মা।

—তা বলে ত আর আমার চোখ দুটো মিথ্যে নয় বৌমা, আর বুঝ্‌তে পার না বলেই ত সরোজকে বলেছি, একবার নীলমণি কব্‌রেজকে ডাক্‌ত—না বল্‌লে তারও চোখে পড়্‌বে না, মা।

বিনোদিনী আয়নার সামনে আসিয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার মুখের চেহারা স্বাভাবিক নয়। একটু যেন ফ্যাকাসে, চোক দুটা যেন অনেকটা বসিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণের পর মুখের চেহারা যেমন হয়, তেমনি।

কবিরাজ আসিয়া কহিলেন—না, তেমন বিশেষ কিছুই হয় নি। তবে ভীষণ গরম পড়েছে, মা'র বোধ করি তাই রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। আচ্ছা, এই বড়ি কটা খেয়ে দেখ্‌বেন, ঘুম ভালই হবে 'খন।

বিনোদিনী ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। আজ কয়দিন রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু হেতুটা যে কি তাহা তিনি শাশুড়ীকে বলিতেও বাধ বাধ বোধ করেন। কি জানি কুসংস্কারপূর্ণ

বুঝা, যদি ভয় পাইয়া বসেন। নিজেও যে খুব স্বচ্ছন্দ চিত্তে আছেন তাও নয়, মাঝে মাঝে কি যেন এক অমঙ্গল আশঙ্কায় তার বক্ষতল পাথরের মত ভারি হইয়া উঠে, এবং বেশ বুঝিতে পারেন এই আশঙ্কাই তাহার মুখে এমন বিশ্রী ছাপ রাখিয়া চলিয়াছে। অথচ এই ভীতির যে কোন ভিত্তি আছে, এমন কথাও স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিতে বাধে।

সেদিন আদালত বন্ধ ছিল। দুপুরে বিনোদিনী কি একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছেন। খাটে সরোজনাথ একটু গড়াইয়া লইতেছেন। চৈত্রের দুপ্রহর—পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মত বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডটা যেন দাঁত বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে।

বিনোদিনীর কি যেন মনে হইল, স্বামীর কাছে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন—আচ্ছা, তুমি কি স্বপ্ন বিশ্বাস কর?

সরোজনাথ চোখ বুজিয়াই বলিলেন—করি বই কি।

—আচ্ছা, স্বপ্নকে কখনও সত্যি হতে দেখেচ?

—কই না!

—তবে যে বললে, স্বপ্ন বিশ্বাস কর?

—কখন আবার বল্লুম?

বিনোদিনী বিরক্ত হইলেন—স্বামীর ঐ কেমন দোষ, মনস্থির করিয়া কোন কিছু আলোচনা করা তাঁহার আসে না। কিন্তু ঐ কথাটাই আজ কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে—তাই তিনি সহজে হাল ছাড়িলেন না, বলিলেন—আচ্ছা, স্বপ্ন না হয় নাই বিশ্বাস করলে, কিন্তু মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন?

তেমনি চক্ষু বুজিয়াই সরোজনাথ কহিলেন—তাই ত মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন!

এবার সত্য সত্যই বিনোদিনী হাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং এই ভাবিয়া আশ্বস্তও হইলেন যে, যাক ভালই হইল, হয় ত উত্তেজনায় অনেক কিছু বলিয়া ফেলিতেন, তাহাতে ঐ সরল মানুষটার অহেতুক আশঙ্কার আর সীমা থাকিত না।

কিন্তু কথাটা এই যে, আজ প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া বিনোদিনী প্রতিরাত্রে নানারূপ বীভৎস স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই স্বপ্নের গল্পভাগ যত বীভৎসই হোক্ না কেন, প্রতি স্বপ্নে তিনি এইটি বেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, একটা না একটা হিংস্র সর্প ইহার সহিত জড়িত আছেই, এবং তাঁহার নানারূপ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়া হয় ত স্বপ্নের সমস্ত কাহিনীই মনে পড়ে না, কিন্তু স্বপ্নের সেই ভীষণ কল্পিত সর্প টাকে কিছুতেই তিনি জাগর অবস্থাতেও মন হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন না—বুকটা প্রায়ই তাঁহার কাঁপিতে থাকে; এবং চক্ষু বুজিলেই দেখিতে পান, সেই ভয়ঙ্কর জীবটা সহস্র জিহ্বা মেলিয়া তাঁহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। চক্ষু খুলিলেও দেখেন, ব্রহ্মাণ্ডটা অন্ধকারে আবৃত হইয়া ঘুরিতেছে। অনেকক্ষণ পরে আবার সব স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু কেন যে এই সর্পটা তাঁহার মনের কোণে এমন করিয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহা তাঁহার মাথায় আসে না।

কেহ কেহ বলেন, দিনের বেলায় যে জিনিষটা সম্বন্ধে সমূহ আলোচনা করা হয় রাত্রে স্বপ্নাকারে তাহাই মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়া খেলা করিতে থাকে। কিন্তু বিনোদিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিলেন না, দশ-বার বৎসরের মধ্যে কবে বা কখনও তিনি সর্প দেখিয়াছেন বা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তবে একটু একটু মনে পড়ে, শৈশবে এক সময় সর্প দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন এবং বোধ করি অজ্ঞানও হইয়া গিয়া থাকিবেন। তাহার বিধবা মাতা যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা তাঁহার স্বর্গগত পিতার দূরসম্পর্কের এক বিধবা ভগিনীর—নাম হেমনলিনী। হেমনলিনীর বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল। তিনি সন্তানহীনা বলিয়া তাঁহার এক মাতৃ-পিতৃহীন বোনপোকে মানুষ করিতেছিলেন। ইচ্ছা ছিল, মানুষ হইলে ঐ ভগিনী-পুত্র গোবিন্দর হাতে বিষয়সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া নিজে কাশীবাসী হইবেন। একসময় এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন, গোবিন্দ উপযুক্ত হইলে বিনোদিনীকে তাহারই হাতে সঁপিয়া দিতে তাহার মাতাকে অনুরোধ করিবেন। কিন্তু গোবিন্দর ভাল হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া কাহার কাছে নাকি কি মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়া সে বনে জঙ্গলে সাপখোপ মারিয়া, কাহাকেও ভূতে ধরিলে ঝাড়ফুঁক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকসময় সে সাপ ধরিয়া আনিয়া, বিষদাঁত

ভাঙিয়া পাড়ার ছেলেদের এবং বিশেষ করিয়া বিনোদিনীকে ভয় দেখাইত। পাড়ায় যে ছেলেদের ভালছেলে বলিয়া নাম, তাহাদের ঘরে মরা-সাপ ফেলিয়া আসিত, আর বিনোদিনীর কাছে বুক ফুলাইয়া হাসিয়া কহিত—জানিস্ বিনোদ, ঐ বিষ্টে হালদারটা পড়ে পড়ে ছোঁড়াটার চেহারা দেখ্ না—যেন তালপাতার সেপাই। পড়েও ছাইপাঁশ গাদাখানেক, বলুকদিকি আমার মন্তর ছুলাইন! ... হেঁ সাপ ত সাপ, ভূতের মামা মাম্‌দো পর্য্যন্ত বাপ বাপ বলে পালাবে না! ... বলিয়া গোবিন্দ দাঁত বাহির করিয়া হাসিত।

বিনোদিনীর মা ও পিসির কাছে বিষ্টু হালদারের সুখ্যাতির সীমা ছিল না—সে নাকি বি. এ তে জলপানি পাইয়াছিল। বিনোদিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—যাও সাপুড়ে, সাপ ধরে ধরে বেড়ায় আবার দেমাক, বিষ্টু দা'র তুমি পায়ের যুগ্যিও নও।

গোবিন্দ মুখ হাঁড়িপানা করিয়া শুধু বলিল—হুঁ!

তার পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই চীৎকার করিয়া বিনোদিনী শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং ভূমিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। পিসিমা ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, একটা মস্ত কৃষ্ণ সর্প বিছানায় মরিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না, ইহা কাহার কাজ। অনেককষ্টে বিনোদিনীর চৈতন্য ফিরিল কিন্তু গোবিন্দ সেই যে গা-ঢাকা দিয়াছিল। দু তিন দিনের পূর্ব্বে আর বাড়ী ফেরে নাই।

বিষ্টু হালদারের সহিত বিনোদিনীর বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনা গেল যে বিষ্টু হালদার হার্টফেল করিয়াছে। খবরটা সকলের আগে দিল অবশ্য গোবিন্দ। বিনোদিনীর মাতা কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন—কি গুরুবল, কি গুরুবল—মেয়েটা আমার সত্ত হাতের নোয়া খোয়াত, ভাগ্যিস্!

ছেলেটা সত্যই পড়িয়া পড়িয়া মারা পড়িল। গোবিন্দ তেমনি দাঁত বাহির করিয়া বলিত—দেখ্‌লি ত বিনোদ, দেল্‌লি ত—এয়সা মন্তর দিলুম ঠুকে—হেঁ হেঁ!

বিনোদিনী কোন কথা বলিত না, গোবিন্দকে দেখিলে তাহার মুখ এতটুকু হইয়া যাইত। তারপর পিসিমা সরোজনাথের সহিত সম্বন্ধ করিয়া বিনোদিনীর বিবাহ দিলেন। সেই শুভাকাঙ্ক্ষিনীর কথা মনে পড়িলে আজও বিনোদিনীর চোখে জল আসে। সে পিসিমা, সে মাও আর নাই—তাঁহারা কিছুদিন কাশীবাস করিয়া অনেকদিন স্বর্গে গিয়াছেন। বিনোদিনীর বিবাহের পর গোবিন্দ সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল আর দেশে ফেরে নাই।

আজকে হঠাৎ ঐ সকল বীভৎস স্বপ্ন সম্বন্ধে কারণ খুঁজিতে গিয়া বিনোদিনী ভাবিলেন হয় ত শৈশবের সেই সকল স্মৃতিই ইহার কারণ। কিন্তু তবুও তাঁহার বুকটা হাল্‌কা হইতে চায় না।

* * *

ভীষণ গরম পড়ায় সে দিন রাত্রে সরোজনাথের তেমন ভাল নিদ্রা হয় নাই, ভোরের বাতাসে সেই সবে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; এমন সময় তিনি কার সুতীব্র রোদন ধ্বনিতে ধড়মড় করিয়া শয্যাতে উঠিয়া বসিলেন। বিনোদিনী যেন কাঁদিতেছেন বলিয়া বোধ হইল। সরোজনাথের বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল; আচম্‌কা কান্না শুনিলে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইতেন। কিন্তু কান্না থামিতে চায় না, বরং একটা আর্ত্তস্বরের মত অধিকতর তীব্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সরোজনাথ শয্যা হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—ইয়ে বিনোদ, ইয়ে কান্না ...

বিনোদিনী শুনিতে পাইলেন না, অগত্যা সরোজনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে নামিয়া আসিয়া একেবারে বিনোদিনীর ঋজু দেহটার পাশে বসিয়া পড়িলেন। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে দেখিলেন, ঘামে বিনোদিনীর বস্ত্রাদি ভাসিয়া যাইতেছে। মুখ তাঁর মড়ার মত ফ্যাকাসে, চক্ষু নিমীলিত এবং নাসারন্ধ্র হইতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে। হাত-পা সমস্ত কঠিন—আড়ষ্ট। কতকটা ফিটের মত। তিনি ঝাঁকানি দিয়া ডাকিলেন—বিনোদ, কাঁদছ কেন, ইয়ে হল কি?

ঝাঁকানি খাইয়া বিনোদিনী চক্ষু চাহিলেন কিন্তু আর্ত্ত-

স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—সাপ সাপ, পালাও পালাও ... ঐ ধর্‌লে রে! বংশীকে বাঁচাও, ঐ এল ...

শুনিবামাত্র সরোজনাথ দুই লাফে খাটের উপর চড়িয়া মশারি ছিড়িয়া খুঁড়িয়া দমাদম করিয়া তাহার উপর নৃত্য করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতে লাগিলেন—ইয়ে সাপ! মানদা, তিনু ঠাকুর! ইয়ে মা—সাপ সাপ ইয়ে ...

তারপর সরোজনাথের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। হাত-পা ছুঁড়িয়া নৃত্য করিতে করিতে কেবল 'ইয়ে ইয়ে' করিতে লাগিলেন। স্বামীর তাথৈ নৃত্যে বিনোদিনীর স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছিল; এখন তিনিই স্বামীকে ধরিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন—ও রকম কর্‌ছ কেন?

সরোজনাথ তেমনি লাফাইতে লাফাইতে বলিলেন—পালাও পালাও—ইয়ে সাপ, মানদা, তিনকড়ি ...

শব্দ শুনিয়া বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিলেন। বিনোদিনীর বড় মেয়ে গৌরী ঠাকুরমা নবীনকালীর কাছেই শুইত, সেও ছুটিয়া আসিয়া পিতার সেই তুরীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নবীনকালীর ভোরের দিকে একবার ঘাটে যাইবার প্রয়োজন হয়। চীৎকার শুনিয়া তিনিও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন—হ্যাঁ বৌমা, সাপটা কি তাহলে তোমাদের ঘরে এসে ঢুকেছে? ও মাগো, কি হবে গো ... বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, ও বাবা ... সিধু মিস্তিরির কাছে একবার ছুটে যা না মানদা, ও তিনকড়ি ঠাকুর, উবু হয়ে জন্তুর মতন তুই হোথায় বস্‌লি যে? একটা নাটি নে এগিয়ে আয় না রে উড়ে মেড়া! ...

কিন্তু তিনকড়ি ঠাকুরের নড়নচড়নের কোন লক্ষণই মিলিল না, সে বসিয়া বসিয়াই কাঁপিতে লাগিল।

সকলের মধ্যে ঝি মানদারই একটু যা সাহস দেখা গেল। ইতিমধ্যে বিনোদিনী সরোজনাথ ও বংশী ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মানদা তড়াক করিয়া গিয়া ঘরের শিকলটা তুলিয়া দিয়া আসিল এবং মুখ চোখ বাহির করিয়া বলিল—সকলে আপনারা যখন দেখেচ তখন আমিও একটা কথা বলি মা। এই কাল য্যাখন বাসুন মাজছিনু ত্যাখন পেছন দিকে মুখ করে দেখি, ওমা এই এত বড় একটা সাপ পাঁচিলের ওপর রোদ পুইছে, তাড়া দিতে কম্‌নে যে পাইলে গেল আর দেখ্‌তে পেনু নি ... বলিয়া মানদা দুবাহু প্রসারিত করিয়া সর্পের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া দিল।

ব্যাপারটা এই যে, আজ ভোরে ঘাটের পথে পা ফেলিতেই নবীনকালী হঠাৎ চম্‌কাইয়া সরিয়া আসিলেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি দেখিলেন যে, একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্প পথে লম্বা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পায়ের আওয়াজ পাইয়া সর সর করিয়া সর্পটা বাগানের দিকে চলিয়া গেল। মানদার কথায় নবীনকালীর সন্দেহ রহিল না যে, এই সর্পটাই গতকল্য মানদার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আবার তাহাই ইতিমধ্যে সরোজনাথের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া তিনি ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিলেন—তবে কি হবে মানদা, একবার যা না ছুটে সিদ্ধেশ্বরের কাছে—ঘরে সপ্প নিয়ে বাস ত চল্‌বে না, ও বাবা ...

মানদা সাপুড়েকে ডাকিতে ছুটিয়া গেল। নবীনকালী সরোজনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—মা-মন্‌সা ক্ষেপেছে বাবা, এবার মায়ের ভাল করে পূজোআচ্চা দিও।

সরোজনাথও ফোঁপাইয়া কহিলেন—হাঁা ইয়ে বড্ড ক্ষেপেছে মা। ই-য়ে একেবারে তাড়া, ইয়ে দাঁত বের করে ...

এতক্ষণ পরে বিনোদিনীর হঠাৎ স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি নবীনকালীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—সাপটাকে উনিই দেখেচেন, আমি চোখে দেখি নি মা; কিন্তু তবে বলি শুনুন। ভাববেন বলে তাই এত দিন বলি নি। এই-যে আমার শরীর খারাপ সে ত ঐ সাপটার জন্যে। রোজ রাত্তিরে সাপটাকে আমি স্বপ্নে দেখ্‌তুম। কাল কি দেখ্‌লুম জানেন? দেখ্‌লুম, সাপটাকে কে একজন জটাজুট পরা ভয়ঙ্কর লোক ছেড়ে দিয়ে গেল। কিন্তু সে যে সত্যিই আমার ঘরে এসেছে, তা ত জানি নি মা। তাই ত বলি স্বপ্ন ত মিথ্যে হয় না, ভাগ্যিস উনি দেখ্‌লেন তাই ত ...

সরোজনাথ বলিলেন—ইয়ে তুমিই ত কাঁদছিলে, তুমিই ত

দেখেচ ইয়ে এত বড় জিব বের করে—আমি ত দেখি নি।

বিনোদিনী ব্যাপারটা অনুমানে বুঝিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন বুঝিতে পারিলেন না। ইহা যে স্বামীরই আর একটি ছেলেমানুষী তাহা বুঝিতে তার আর বাকি রহিল না; কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সকলকে কিছু বলাও চলিবে না, কারণ তাহা হইলে হাসাহাসির আর শেষ থাকিবে না। তবে মানদার বা শাশুড়ির কথাটা ত মিথ্যা নয়। স্বপ্নের সহিত বাস্তবের এমন সৌসাদৃশ্য দেখিয়া স্বপ্নকে তিনি তুচ্ছ করিতে পারিলেন না, তবে সর্পটা যে কাহারও ক্ষতি করে নাই এই ভাবিয়া তিনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

এখন বাস্তবের সর্পটাকে লইয়াই বিনোদিনীর উদ্বেগের সীমা থাকিল না।

* * *

ইতিমধ্যে স্বশিষ্য সিধু মিস্তিরি আসিয়া পড়িয়াছিল। কালো যমদূতের মত চেহারা; মাথায় এক গাদা রুক্ষ চুল স্থানে স্থানে জট পাকাইয়াছে। সিধু মিস্তিরির গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদূর, পরনে রক্ত বস্ত্র। সিধু মিস্তিরি তান্ত্রিক, বাজারের ধারে একটা কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। লোকে তাহাকে ভণ্ড বলে—বলে, কালীর নামে সিধু মিস্তিরি ব্যবসা চালাইয়াছে। অর্থাৎ নৈবেদ্যের থালায় যতগুলি পয়সা আসিয়া পড়ে সবগুলিই নাকি সে কারণ-রসে ব্যয়িত করে। লোকে যাহাই বলে বলুক, সিধু মিস্তিরি ঝাড় ফুঁক করে ভাল। রোয়াকে মড়ার মাথাটা নামাইয়া রাখিয়া সিধু মিস্তিরি বীভৎস হাসি হাসিয়া বলিল—মা ঠান, কি আমায় অনুস্মরণ করেছেন?

—হ্যাঁগো বাবা, মা-মনসার যে আজ কদিন ধরে বড় অনুগ্রহ হয়েছে ধন্, ঘুমিয়েও যে নিস্তার নেই ... ভুলিয়ে ভালিয়ে নে যাও বাবা।

—সে কি আর বল্‌তে মা-ঠান্! ছটো মন্তর পড়্‌ব আর মাকে কোঁচড়ে নে বেরিয়ে যাব। হেঁ হেঁ—তবে না আমি সিধু পূজুরি, নারাণ বৈরিগির বেটা।

বলিয়া সিধু চোখ দুটাকে একটু পাকাইয়া বিশ্রী করিয়া হাসিল, বলিল—দেখি মায়ের অধিষ্টেনটা এখন কোথায়। ছুটো কড়ি চাল্‌ব আর সব সিধে হয়ে যাবে। হেঁ হেঁ—মন্তর ত আর সোজা নয়—কি বল্ রে মদ্‌না।

সাপুড়েকে দেখিয়া সরোজনাথের বক্ষ দুরু দুরু অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন—ই-য়ে দেখ সিদ্ধেশ্বর, সপ্পটা দেখ্‌লেই প্রথমে তার মাথাটা টিপে ধর্‌বে, আর ইয়ে কামড়ে যদি দেয় ত বয়ে গেল—জীবটা অমনি টেনে ধরবে না! কামড়ানো, ইয়ে আমি রইচি না!...

মাঝে মাঝে সরোজনাথের এই রূপ পরামর্শ দিবার খেয়াল আসিত। সে পরামর্শের কাছে সংসারের পাকা মাথাও হার মানিতে বাধ্য। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি তিনু ঠাকুরকেও মাংস রান্না শিখাইতেন।—

—বেটা পাঁঠা রাধ্‌তে জানিস্ না, ইয়ে শক্তটা কি শুনি? প্রথমে মাংস দিলি, তারপর জল, তারপর হলুদ, তারপর ঘি, তারপর ... শক্তটা কি শুনি?

এ ক্ষেত্রে কিন্তু সিদ্ধেশ্বর পরামর্শ গ্রহণ করিল কিনা বুঝা গেল না। সে ইতিমধ্যে সেই সিঁদূর চর্চ্চিত মড়'র মাথাটা মেঝেতে রাখিয়া চারপার্শ্বে খড়ি দিয়া চৌকা চৌকা ঘর কাটিতে স্বরু করিয়াছে। শেষে কতকগুলি কড়ি সেই ঘরগুলির কোণে কোণে বসাইয়া দিয়া উবু হইয়া বসিয়া বিড় বিড় করিয়া কি সব মন্ত্র আওড়াইতে স্বরু করিল। এবং মাঝে মাঝে জিহ্বা ও ওষ্ঠের সাহায্যে একরূপ হিস্ হিস্ শব্দ করিতে লাগিল। খানিক এই রূপ করিবার পর সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঘর হইতে একটা কড়ি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া সরোজনাথের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া একটু পরে থামিল। সিধু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বাস্, বাজিমাৎ! দেখ্‌লি ত ঝি, তুই ত আর আমাকে কিছু বলিস নি, তবু ছাখ্, কড়িটা দাদাবাবুর ঘরের পানেই চলেছে—হেঁ হেঁ—মন্তর ত আর ভুল হবার নয়।

তারপর সিধু একটু হাঁক দিয়া কহিল—এই মদ্‌না, তুই যে হোথাকে ঝিমুতে নেগে গেচিস ওঠ, ওঠ,।

মদন সিধুর সাকরেদ—জলেস্থলে, সবেতেই। যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়া তার একটা অভ্যাস। সে ধড়মড় করিয়া দাঁড়াইয়া কোমরে

কাপড়টা কষিয়া বাঁধিল, এবং একহাতে একটা বংশদণ্ড ও অপর হাতে একটা সরাচাঁপা হাঁড়ি লইয়া বলিল—চল মিস্তিরি, উঃ বড্ড ঘুম পেয়েচে। ধুস্।

বলিয়া মদন চোখ রগড়াইতে লাগিল। সিধু সরোজনাথের ঘরটা খুলিয়া দিয়া বলিল—যা ঢোক্, সরাচাপা দিবি আর বেরিয়ে আস্‌বি। বাস্, ত'রপর ঘরে গে মায়ের চন্নামেত্তর—হেঁহে।

ত' মদনের সাহস আছে। সিধু পাও বাড়াইল না—মাথাটা বাড়াইয়া কেবল তাহাকে পথ বাতলাইতে লাগিল।—যা ওদিকে, ঐ খাটের নাবোয়, ওই চৌকির মাথায়, ধুস্ হোথাকে জানাবে। কিন্তু উহার বেশী আর সিধুর সাহসে কুলাইল না।

শেষে গালিগালাজ করিয়া, দাঁত খিঁচাইয়া, এমন কি কুঁজার জল উল্টাইয়াও যখন সর্প বাহির হইল না তখন কিন্তু সিধুর বিকসিত দন্তের ফাঁকে সেই কদর্য্য হাসি মিলায় নাই।—হেঁ হেঁ, মা কি আর থাকে, মন্তরের তেজে পালাতে পথ পায় নি। ভয় পাচ্ছ কেন মা, ঠায় যা মন্তর ছেড়েচি বাসায় গিয়ে পটল না তোলে ত আমি লারাণ বৈরাগীর বেটাই নই, হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে মদন আবার বসিয়া বসিয়া হাই তুলিতেছিল, আর ঝিমাইতেছিল। সিধু তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া নবীনকালীকে বলিল—এইবার কালীর নামে পেন্নামিটা দাও মা। হেঁ হেঁ বড্ড বেলা হল। এ সব দৈবের কাজ, বুঝলে না মাঠান! তেরশিকেই নিয়ে থাকি, তুমি না হয় পাঁচ শিকেই দিও, এখন আছে কি? বেশ বেশ, কাল না হয় পাঠিয়ে দিও 'খন—চ' রে মদনা।

বলিয়া সিধু মিস্তিরি ঘুমন্ত মদনকে একরূপ টানিয়া তুলিয়াই বাহির হইয়া গেল। সরোজনাথ চীৎকার করিয়া বলিলেন—ইয়ে সিধু, আমার জুতো জোড়াটা একবার দেখেচ কি? কিন্তু সাপুড়ে তখন মোড় পার হইয়া গিয়াছে।

বিনোদিনী ইহা একরূপ আশাই করিয়াছিলেন। স্বপ্নের পরিহাস এবং স্বামীর ছেলেমানুষীর কথা মনে করিয়া তখনও তাঁর হাসি পাইতেছিল। তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। বাহিরে সর্প বাহির হইলেও ঘরে ঢুকিবার কোন কারণ ছিল না। তবে সিধুর রকম সকমে তাহারও কিছু বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, হয় ত বা সত্য; কিন্তু যেরূপভাবে সিধু পলায়ন করিল তাহাতে তাঁর বিশ্বাস ত হইলই না বরং এক বিষয়ে একটু সন্দেহ হইতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সন্দেহটা তাঁর মিথ্যা নয়। দেরাজের উপর হইতে সরোজনাথের সোনার ঘড়ি এবং আলনার জামা হইতে সোনার বোতাম উভয়েই অন্তর্ধান করিয়াছে। সংবাদটা তখন আর তিনি কাহাকেও দিলেন না।

কিন্তু সিধুর কথাটা একদম মিথ্যা হইল না। ঠিক বাসায় না মরিলেও সাপটা পুকুর ধারের কলাগাছের তলায় মরিয়া পড়িয়া আছে, দেখা গেল। এবারে খবরটা আগে দিল তিনকড়ি ঠাকুর—সে কলাপাতা কাটিতে গিয়াছিল। বিনোদিনী গিয়া দেখিল একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপকে কে যেন ছিঁড়িয়া কুটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পায়ের আওয়াজে দুতিনটা বেঁজি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সুতরাং সাপটা যে সিধুর মন্তরে মরে নাই ইহা ঠিক। কিন্তু নবীনকালী বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন—হাঁ মন্তর বটে ঐ সিধুর, দেখ্‌লে—দেখ্‌লে একবার বৌমা। আমি কিন্তু বাবু, ব্রহ্মময়ীকে একজোড়া কাপড় দিয়ে' আস্‌ব—বাঁচালে মা!

বিনোদিনী তাহাও বারণ করিতে পারিলেন না। ইচ্ছা আছে সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সুদ শুদ্ধ আদায় করিয়া লইবেন। সর্পের নামে দিনে ডাকাতি—ভণ্ড কোথাকার!

সরোজনাথের কিন্তু তখনও সর্পভয়টা যায় নাই। বাড়ীর বাহির হওয়া অনেকদিন ত তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি তিনি বাড়ীতেও বড় নড়েন চড়েন না, এবং যদি বা নড়িবার দরকার হয় তাহা হইলে পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত মোজা আছেই। সাপ যে মারা পড়িয়াছে ইহা তিনি বিশ্বাস করতে চান না। বলেন—ইয়ে যদি কামড়ায়, যাক্‌গে কামড়াক্‌গে, বয়ে গেল—জিবটা অমনি টেনে আন্‌ব না! একটা জরুরী মামলা এই যে! ইয়ে

মানদা, ঐ কোণটা একবার ছাখ্ ত মা, কি একটা নড়ছে যেন, হুঁ হু।

* * *

ইহার প্রায় বছর দুই পরের কথা। ইতিমধ্যে সিধু মিস্তিরি ও মদন কয়েক মাস করিয়া জেল খাটিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছে। ইহার পর আর কালী মূর্ত্তির ব্যবসা চালানো স্বাভাবিক নয়, কারণ সিধুকে চিনিতে কাহারও বাকী নাই। অগত্যা সিধু একটা কাঠের গোলা খুলিয়াছে। কাঠ চাঁচ, পয়সা নাও—ইহা মন্দ কথা নয়, মদনও নাকি সেখানে রেঁদা চালায়।

সরোজনাথ বলিতেন—ইয়ে আমার জিনিষ চুরি করা, ঘুঘু দেখেচ, ফাঁদ দেখ নি। ইয়ে সরোজ উকিল, নবনে নয়—চালাকি হবার জো নেই।

বিনোদিনী ভাবেন বুঝি স্বামীর মাথা খুলিতেছে। উর্দ্ধমুখে চাহিয়া কপালে দুই কর ঠেকাইয়া বিনোদিনী বলিতেন—তাই কর ঠাকুর। কিন্তু কই? সে লক্ষণ ত বড় দেখা যায় না। তবে আজকাল সরোজনাথ নবীনকে শুদ্ধ পরামর্শ দিতে সুরু করিয়াছেন।—ইয়ে দেখ নবীন, ছেলেমানুষ ফট্ করে ভারী মামলাটা নিয়ে ফেল্‌লে, ইয়ে কোথায় কি গুলিয়ে ফেলবে। তা দেখ, দাবা-বড়ে দেখেছ ত? দুটো বড়ে এমন টিপে দোব, সব ঘুরে যাবে——ইয়ে বুঝ্‌লে নবীন, ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই।

নবীন আপ্যায়িত হইয়া শুধু হাসিল। সরোজনাথ উৎসাহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন—তা দেখ, আজ বিকেলেই না হয় এস একবার—ইয়ে—সময় ত নেই।

বলিয়া সরোজনাথ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। সুতরাং অনেক সময় নবীনেরও সন্দেহ হয় বুঝি পাগলটার মাথার খুলি পরিষ্কার হইতেছে।

সম্প্রতি সরোজনাথের কন্যা গৌরীর বিবাহের পাকা-পাকি হইয়া গিয়াছে। এই বৈশাখেই শুভকার্য্য হইবার কথা, সুতরাং মতিহারী হইতে সরোজনাথের দাদা পঙ্কজনাথ সস্ত্রীক আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেখানকার ডেপুটি। ভাইকে চিনিতে ত তাঁর বাকী নাই—হাঙ্গামা পোহাইবে কে?

এই সব দেখিয়া শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, দুবৎসর আগেকার সেই সর্পভীতিটা এখন বাড়ী হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছে। বিনোদিনী আর কোন বীভৎস স্বপ্ন দেখেন নাই। সরোজনাথও একরূপ নির্ব্বিঘ্নে চলাফেরা করিতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় ছেলেদের সহিত তেমনি চোর চোর খেলিতেছেন।

সেদিন সকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঘরকন্নার খেলা হইতেছিল। কেহ চাকর সাজিয়াছিল, কেহ ঝি, কেহ মেয়ে। পঙ্কজনাথের কন্যা শান্তি আর বংশী প্রায় সমবয়স্ক—তাহারা 'বর-বধূ' সাজিয়াছিল; কিন্তু ছেলে হইবার মত উপযুক্ত কাহাকেও না পাওয়ায় অগত্যা সরোজনাথকেই হইতে হইয়াছিল। তিনি শান্তির ক্রোড়ে শুইয়া শুইয়া দোল খাইবার মত ক্ষুদ্র না হওয়ায়, অগত্যা বসিয়া বসিয়াই দুধের বদলে ঝিনুকে করিয়া জল গিলিতেছিলেন। বাড়ীর আর সকলেই তখন ভবিষ্যৎ উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। সুতরাং সরোজনাথ ছেলেমানুষী করিবার বেশ একটু নিরিবিলি অবসর পাইয়াছিলেন।

ঠিক এমনি সময় রাস্তা দিয়া একটি সাপুড়ে বাঁশীতে একটা মেঠো উদাসীন সুর বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। ছেলেরা ধরিয়া বসিল—কাকাবাবু, সাপ খেলা দেখাতে হবে, ডাক না। একবৎসর পূর্ব্বে হইলে সরোজনাথ চমকাইয়া উঠিতেন, কিন্তু আজ তিনিও বেশ একটা কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন। মানুষের স্বভাবই তাই—অতীত এবং ভবিষ্যৎটাকে সে চাপা দিতে পারিয়াছে বলিয়াই বাঁচিয়া থাকা তার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

সাপুড়েকে উঠানে ডাকিয়া আনা হইল। লম্ববান বেণী মাথার উপর চুড়া করিয়া বাঁধা। কানে কুণ্ডল, গায়ে এবং পরনে গৈরিক বস্ত্র। পায়ে নাগরা। সাপুড়ে টানিয়া টানিয়া হিন্দুস্থানীতে কথা বলে—কথার আড়ম্বরে এবং বাঁশীর টানে শ্রোতৃবর্গকে জমাট বাঁধাইয়া দেয়।

সাপুড়ে বলিল—কা সাঁপ দেখ্‌লায়গা বাবুজি।

সরোজনাথ হাসিয়া বলিলেন—ইয়ে দেখিয়ে দাও না, তোমরা যে যে সাপ হ্যায়, দেখিয়ে দাও না।

সাপুড়ে সাপ খেলাইতে লাগিল। বাঁশীর আওয়াজে

বাড়ীর সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। বিনোদিনীও বাদ যান নাই। দূরে দালান হইতে তিনি দেখিতে লাগিলেন। সহসা তাঁর অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল; আর কিছুর জন্য নয়—দেখিলেন, সরোজনাথ প্রায় সাপুড়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছেন। যদিও বিষ দাঁতভাঙা, তবু সাপ ত বটে; অত কাছে যাওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নয়। বিনোদিনী তিনু ঠাকুরকে দিয়া বাবুকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। তিনকড়ি কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, বাবুকে গিয়া বলিল—বাবু, মা আপ্‌নাকে ডাকুচি।

সরোজনাথ বিনোদিনীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—ইয়ে কি বল্‌ছ, বিনোদ?

—সাপের অত কাছে যেও না, বুঝ্‌লে?

সরোজনাথের সঙ্গে সঙ্গে সাপুড়ের এদিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়াছিল। সহসা বিনোদিনীর উপর তার দৃষ্টি পড়িতেই সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিনোদিনী ভাবিতেছিলেন—লোকটার দৃষ্টিটা কি বিশ্রী, পুরুষ জাতটাই এমনি—মুখে আগুন!

সাপ খেলা তাঁর ভাল লাগিতেছিল না। মাথাটা তাঁর যেন ঘুরিয়া উঠিল—ব্রহ্মাণ্ডটা যেন অন্ধকারে আবৃত। কেন এমন হইল? বোধ হয় অত্যধিক অগ্নিতাপ লাগিয়া থাকিবে। তিনি অজ্ঞানের মত মাথায় হাত দিয়া দালানে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু বুজিয়া দেখিলেন, সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—দুই বৎসর আগে স্বপ্নে যে মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন! ইহার সহিত যেন আজিকার ঐ সাপুড়েটার কোথায় মিল আছে। বিনোদিনীর মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ সাপুড়েটার বীভৎস মূর্ত্তি বিন্দু বিন্দু কমিতে কমিতে যেন এক বিকট অন্ধকারময় সাগরের সৃষ্টি করিতেছে, আর তিনি তাহারই অতল তলে একটু একটু করিয়া ডুবিয়া যাইতেছেন। মানদা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উঠানে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সাপুড়ে একটা প্রকাণ্ড গোখরো লইয়া খেলাইতে ছিল। বাঁশী তাহার মহানন্দে বাজিয়া চলিয়াছে, আর সাপটা তাহারই তালে তালে ফণাটা অনেকটা উপরে তুলিয়া দুলাইতেছে। সহসা সাপুড়ের মুখ ভীষণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে সাপটাকে বাঁশীর উপর তুলিয়া সরোজনাথের ঘাড়ের উপর ছুড়িয়া দিল। সাপটা তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া দূরে পলায়ন করিল বটে কিন্তু সরোজনাথ চীৎকার করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন—ইয়ে সাপ, সাপ ধরলে, ধরলে, ইয়ে মানদা, দাদা, বিনোদ...

সকলে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে, সরোজনাথের ঘাড়ের একস্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না, ব্যাপারটা কি। কিন্তু সাপটা বিষাক্ত কি?

এদিকে বেগতিক দেখিয়া সাপুড়েটা পিছন ফিরিয়াছিল, এমন সময় তিনু ঠাকুর তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল—

—সড়া ডাকু!

গোলমাল শুনিয়া পাড়ার অনেকেই লাঠিসোঁটা লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। প্রথমে সাপুড়েটাকে তাহারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল; তারপর অদূরে চাহিয়া দেখিল, সাপটা নির্জ্জীবের মত দেওয়ালের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। একসঙ্গে অনেক ঘা পড়িতেই সাপটাকে আর সাপ বলিয়া চিনিবার জো রহিল না। তখন সকলে জল পাখা ও বরফ লইয়া সরোজনাথের চারিপার্শ্বেই ব্যস্ত। সাপের বিষ মুহূর্ত্তের মধ্যেই মানুষকে মারিয়া ফেলে না, একটু একটু করিয়া মারে কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে সর্পদষ্টের আর কিছুই থাকে না। সরোজনাথ পঙ্কজনাথের কোলে মড়ার মত বিবর্ণমুখে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন, বোধ করি জ্ঞান নাই। তবে মাঝে মাঝে অস্ফুট ধ্বনি করিতেছেন—ইয়ে ধরলে—সাপ সাপ—দাঁত বের করে। মাথার উপর তাঁর অজস্র পাখা চলিতেছে!

এদিকে ভিতরে নবীনকালীর ফিট হইয়াছে। বিনোদিনী একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছিলেন, কলরব শুনিয়া আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বেকার সেই বীভৎস ছবিটা আবার যেন তাঁর মাথায় ফুটিয়া উঠিল। সেই জটাজুটধারী লোকটার হাত হইতে সাপটা এবার তার স্বামীর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। বিনোদিনী আবার সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে হুতিন জন ডাক্তার আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করিয়া তৎক্ষণাৎ ঔষধ দিলেন এবং ব্যাণ্ডেজ করিয়া সরোজনাথকে শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উদ্বেগ কাহারও কমিল না। ডাক্তার আসিতে অন্তত একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছে। সর্প বিষাক্ত হইলে বিষ এই সময়ের মধ্যেই রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া থাকিবে। সুতরাং ফল সুনিশ্চিত—তাহার রোধ করা শিবেরও অসাধ্য।

তারপর সকলে সাপুড়েটাকে লইয়া পড়িল। যে যত পারিল গালিয়া মারিল এবং পুলিস আসিয়া পড়িলে তাহাকে থানায় চালান দিল। পাড়ায় পাড়ায় হুলুস্থুল।

সাপুড়েটা কোন কথা বলিল না, নড়িলও না—পড়িয়া পড়িয়া মার খাইল। থানায় দারোগার প্রশ্নে বলিল—হাঁ, সাপ্‌টা বিষাক্ত বটে; বাবুর বাঁচবার কোন আশা নেই। সাপুড়ে একটু হাসিল।

—এমন বিষাক্ত সাপ কেন রেখেছিলে?

সাপুড়ে উদ্ধত স্বরে কহিল—অমন হুচারটে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

—এর প্রতিকারও তোমার কাছেই আছে?

—শিবের অসাধ্য।

—সাপটা গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলে কেন?

—জানি না, মাথার ঠিক ছিল না।

ইহার বেশী আর সাপুড়ের কাছ হইতে কিছুই পাওয়া গেল না। এদিকে সরোজনাথকে লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিতে লাগিল। কিন্তু হু এক দিনের মধ্যেই যে জিতিবার সে-ই জিতিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নীল ঋজু অসাড় হইয়া গিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তে সরোজনাথের মুখের কত রকম চেহারা হইতেছিল। কখনও হাসিতেছেন, কখনও গম্ভীর, আবার কখনও মুখ ভেঙ্‌চাইতেছেন—যেন একটি ঘুমন্ত নির্ব্বাক শিশু অস্পষ্ট স্বপ্নের ঘোরে মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ কথাটি এই—ইয়ে নবীন, দেখ, খালি হুটো বড়ের চাল—বাস্‌, বাজিমাৎ, ইয়ে সব ঘুরিয়ে দেব, ভয় কি?

তারপর সরোজনাথ আর নড়িলেন না। আজ নবীন তাঁর পার্শ্বেই বসিয়াছিল, চোখ দিয়া তার টস টস করিয়া জল পড়িতেছিল। বিনোদিনী উন্মত্তের মত স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

* * *

কিন্তু শোক করিলেই যদি মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিতে পারিত ত কোন কথা ছিল না। সুতরাং বিনোদিনীও এক দিন সব সহিয়া চুপ করিলেন। তবে যাহাকে লইয়া এত দিন ঘর করিয়াছেন, প্রাণ ঢালিয়া যাঁহার সেবা করিয়াছেন, প্রতিটি দিনের তাঁর অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলিও আজ কত বড় হইয়া তাঁর বুকে বাজিতে লাগিল। বিনোদিনী আজ বেশ বুঝিলেন, এই পৃথিবীতে সেই অকর্ম্মণ্য লোকটারও কত প্রয়োজন ছিল। চতুর্দ্দিকে খালি প্রয়োজন আর প্রয়োজনের অগ্নিময় নিগড়, খুশীর হাল্কা হাওয়ায় অপ্রয়োজনের গানে সে নিগড়কে ভাসাইয়া দিবে কে? পারিতেন এক মাত্র সরোজনাথ।

প্রায় বছর ঘুরিয়া আসিল। গৌরীর বিবাহের আবার কথাবার্ত্তা হইতেছে। কিন্তু নবীনকালীর মুখের দিকে চাহিলে মনে হয়, অনেকখানি তাঁর বহু পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। শ্বেতাম্বর, শূন্যহস্ত বধূটির দিকে চাহিয়া তিনি হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। বংশীকে তিনি নয়নের আড়াল করিতে চান না।

সরোজনাথের অগ্রজ পঙ্কজনাথ বলিয়া কহিয়া এখানেই বদলি হইয়া অনুজের সংসারটি মাথায় করিয়া আছেন। তাঁহারও মুখের দিকে চাহিলে কান্না আসে।

আসল কথাটা বলিয়া রাখি। ঠিক স্বহস্তে হত্যা না করায় সাপুড়েটার ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। কাগজে এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হওয়ায়, ইহার পিছনে যেন একটা গুরুতর রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, লোকটা পাগল কিংবা সরোজনাথের পুরাতন শত্রু কিংবা কাহারও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা; কিন্তু রহস্যটা রহস্যই রহিয়া গেল।

বিনোদিনী কিছু কূল কিনারা পাইতেন না, .. তবে সময় সময় ভাবিতেন, বুঝি ছদ্মবেশে যমরাজের দূত, যাহাকে তিনি বহু পূর্ব্বেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই যে এমন বাস্তব

মূর্ত্তিতে চোখে পড়িবে কে জানিত? ... কিংবা, কিংবা ... কথাটা তিনি ভাল করিয়া ভাবিতে পারিলেন না। বিনোদিনীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, স্বপ্নের কথা মিথ্যা হয় না।

তিনি এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপ অতীতের স্মৃতির জাল বুনিতেছেন, এমন সময় মানদা আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল। পত্রটি তাঁহারই নামে কিন্তু পত্র তাঁহাকে দিবে কে? যতদূর সম্ভব ভাবিয়া বিনোদিনীর পিতৃমাতৃকুলের কাহাকেও ত মনে পড়িল না, তবে? দারুণ বিস্ময়ে বিনোদিনী পত্র খুলিয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই চোখ সরাইয়া লইলেন—তিনি যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায় ভগবান, এমনি করিয়াই কি হতভাগিনীকে সাজা দিতে হয়! একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, বিনোদিনী কোন রকমে এক নিঃশ্বাসে পত্রটিকে শেষ করিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

বিনোদ,

সব কথা খুলিয়া লিখিবার আমার হয় ত সময় হইবে না—আমার নিকট পরপারের ডাক আসিয়াছে। আপনি আসে নাই; আমি নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছি। সুতরাং এ পত্র তোমার হাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এ জগতে আর আমাকে কেহ দেখিবে না।

কিছুই লিখিতাম না, কিন্তু চিরদিন তোমরা, অন্তত, তুমিও একটা গুরুতর রহস্যে আবৃত থাকিবে ইহা আমার বিদেহী আত্মাকে শান্তি দিবে না। আমিই সাপুড়ে, তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ তুমি, ইহা প্রকাশ করিতে আমার আজ বাধে না। অবশ্য ইহা তুমি বুঝিবে না, কারণ তুমি স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিতে।

ক্ষণেকের একটা দুর্জ্জয় হিংসাপরবশেই তোমার স্বামীকে আমি হত্যা করিয়াছি—তোমার স্বামী দেবতুল্য ছিলেন। কিন্তু বিনোদ, তোমাকে একবার দেখিবার জন্য আমি কত দেশদেশান্তর যে ঘুরিয়াছি, তাহা আজ বলিতে যাওয়া বাতুলতা। তোমার স্বামীগৃহের ঠিকানা আমি জানিতাম না। অবশেষে ভাগ্যক্রমে যখন আমি তোমাকে ধনীর গৃহিণীরূপে দেখিলাম, তখনও আমি তুচ্ছ সেই সাপুড়ে। আমার প্রেমের এত বড় অমর্য্যাদা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল।

হতভাগ্য গোবিন্দ

পুঃ—পত্রটা নষ্ট করিয়া ফেলিও।

সমস্তটা শেষ করিয়া বিনোদিনী তাঁর দুর্জ্জয় অশ্রু-প্রবাহকে রোধ করিতে পারিলেন না। কেন জানি না আজ তাঁর সেই কুমারী-জীবনের একটি হতভাগ্য বালকের প্রতি অনুকম্পাই জাগিতেছিল—ভগবানের কাছে তাহার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন শীঘ্র এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারেন।

ইহার কয়েক দিন পরে পঙ্কজনাথ একদিন তাঁহার একটি পরিচিত জেলখানার কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কি জানি, যদি সেই রহস্যময় সাপুড়েটা সরোজনাথকে হত্যা করিবার কোন কারণ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু গিয়াই শুনিলেন, লোকটা বিষ খাইয়া মরিয়াছে। বিস্ময় তাঁহার আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু কথাটা তিনি বাড়ীর কাহারো কাছে প্রকাশ করিলেন না।—কি জানি, যদি পুরাতন শোক জাগিয়া ওঠে!

চিঠি

শ্রীউমা দেবী

ভাই ঠাকুরপো,—

কি রকম যেন নতুন নতুন লাগ্‌ছে। তুমি আমার ঠাকুরপো? দেওর?—এ যেন কল্পনার অতীত!—তোমার দাদাটি তো বিয়ে করেই এক মাসের মধ্যেই সুদূর সাগর-পারে পালালেন—কোথায় তাঁর ভাইটি আমায় সান্ত্বনা দেবে, তা না, সে সেই বৌভাতের পরদিন থেকেই নিরুদ্দেশ! আজ এক বছর পরে খুড়িমার চিঠিতে জান্‌লুম—হারানো ছেলে ফিরে পাওয়া গেছে—তোমায় নিয়ে তিনি পুরীতে রয়েছেন—আর কি অভিমান করে থাকতে পারি? তাই চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লুম—বার বছরের মধ্যে এই আমার প্রথম চিঠি!—

কিন্তু ভানুদা, কেন আমায় এম্‌নি করে ভুলে রইলে ভাই?—এত কাছে থেকেও কেন এমন পর হয়ে রইলে চিরদিন,—আমি আজো বুঝ্‌তে পারি না!—

সেই তালপুকুরের ধারে আমাদের পাশাপাশি বাড়ী, মনে পড়ে? আমি তখন সাত বছরের আর তুমি কত? বোধ হয় বারো।

স্বপ্নের মত সেই সব দিন চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।—ভানুদা, তখন এই ছোট্ট বেণুটাকে ত কম ভালবাস্‌তে না! প্রতিদিন তাকে ফুলের গহনায় সাজিয়েছ, আদর করেছ, গল্প বলেছ। আমি যেন ছিলুম তোমার ছায়া! মায়ের কাছ হতে লুকিয়ে তোমার জন্যে কুলের আচার চুরি করে আনা মনে পড়ে? তোমার যে কত উপদ্রব কত স্নেহের অত্যাচার সয়েছি দুঃখে নয় আনন্দে আজো যেন সে সব ভাবতে ভাল লাগে। তারপর কি রকম হঠাৎ তোমরা চলে গেলে—যাবার দিন কত কান্না কেঁদেছিলে এখনও ভাবতে আমার চোখে জল আসে। আমি তো বেশী কাঁদি নি—আমি তো ভাবি নি চিরদিনের মত তোমাকে হারাতে বসেছি!

দৈবের বিড়ম্বনা—তারপরে বার বছর পরে কি রকম অভাবনীয় ভাবে দেখা হোল!

আমাদের নেবুতলার পাশের বাড়ীর মেসে হঠাৎ তোমায় একদিন দেখলুম! এত বছর পরে দেখা, তবু একটু চিন্‌তে দেরী হোল না—আমার শৈশব সঙ্গীর মুখখানা যে আমার মনে আঁকা ছিল। আনন্দে বিস্ময়ে বলে উঠলুম, ভানুদা, তুমি এখানে? তুমি উত্তর দিলে না—চোখ নীচু করে বসে রইলে। তোমার নির্ব্বাক মুখের দিকে চেয়ে অভিমানে যখন আমার চোখে জল ভরে এলো—তুমি উঠে জানালা বন্ধ করে দিলে!

লজ্জায় দুঃখে মুষ্‌ড়ে পড়লুম—ভাব্‌লুম তুমি আমায় ভুলে গেছ—তুমি আমায় মনে রাখতে চাও না! মোটা কাপড় আনিয়ে ঘরের জান্‌লায় পর্দ্দা দিলুম—বাবা মাকে একটি কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। তারপর দেড়টি বছর দুজনে পাশাপাশি ঘরে কাটিয়েছি একটি কথা না কয়ে।

কেন এ শাস্তি দিয়েছিলে ঠাকুরপো? অপরাধ কিছু হয়েছিল কি?

বিয়ে হয়ে গেল—তারপর আশ্চর্য্য ব্যাপার! শ্বশুর বাড়ীতে ঢুকেই প্রথম তোমায় দরজায় দেখলুম। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকা ছিল—ভাল করে চাইতে পারলুম না—তবু একবার তোমার দিকে চোখ পড়তেই চমকে

উঠ্‌লুম। কী শীর্ণ অসুস্থ তোমায় দেখাচ্ছিল যেন কত পরিশ্রান্ত, বেদনার ভারে পীড়িত।

রাণীকে জিজ্ঞেস করে জান্‌লুম, তুমি এদেরই খুড়তুতো ভাই।—আশ্চর্য্যি, তোমার মেসের ঘরের সাম্‌নে হোগ্‌লা তুলে সানাই বাজিয়ে সাতদিন ধরে বিয়ের উৎসব চল্ল—তুমি তোমার ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে বসে রইলে।

তোমার পায়ের শব্দ—তোমার চেয়ার্ টেবিল নাড়ার শব্দ পেলুম কিন্তু তোমায় একবারটিও দেখতে পেলুম না।

কেন তখন একবারটিও বল্লে না—বেণু, তুমি আমার বৌদি হবে!

ভানুদা, তুমি বড় নিষ্ঠুর। এই অভিমানী বেণুকে অনেক পরীক্ষাই করেছ।—তোমাকে আজো বুঝতে পারি নি—তুমি যে আমায় ভালবাসো না এ কথা বিশ্বাস করতে যেমন কষ্ট—তোমার অবহেলা—এত কাছে থেকেও এতদূরে থাকার কষ্ট আরো অসহ্য।—কেন ছেলেবেলার দাবীতে আমাদের ঘরে এলে না? কেন নিজেকে অমন করে লুকিয়ে রাখ্‌লে বঞ্চিত করে রাখ্‌লে আজ যে কথা শুনতে ইচ্ছে করে ঠাকুরপো! এখনো কি সময় হয় নি?

খোকন অনেকটা তোমার মত দেখতে হয়েছে—আশ্চর্য্যি না? খুড়িমাকে আমার প্রণাম দিও। তোমার কুশল জানিও।

তোমার
বৌদিদি

(২)

সুচরিতাসু,

তোমাকে 'বৌদি' বল্‌তে পারলুম না ক্ষমা কোর। তোমার চিঠি যেদিন এলো—সেদিন জরটা একটু বেশী এসেছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই চোখে জল আস্‌ছিল, মা মাথার কাছে বসে বাতাস দিচ্ছিলেন। এমন সময় তোমার চিঠি এলো—একটি সাদা কাগজ তার গায়ে কয়টি কালির আঁচড়—আমার এতকালের সাধনা—এতদিনের স্বপ্ন!—

হাতের লেখা চিন্‌তে একটুও দেরী হোল না—সেই ছেলেবেলায় কাঁচা অক্ষর এখন মুক্তোর মত পরিষ্কার সুন্দর—তবু চিন্‌তে পারলুম এ আমারই বেণুর চিঠি। আনন্দে বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল। চিঠিটা স্বযত্নে বালিসের নীচে রেখে দিলুম।

মা বল্লেন, কার রে?—

বল্লুম, জানি না মা—

মা বল্লেন, পড়ে শুনাই, দে।

বল্লুন, থাক্‌গে—

জানি না চিঠিতে কি কথা ছিল, তবু মনে হোল এ চিঠি একান্ত আমার গোপন সম্পদ!

সন্ধ্যে হোয়ে এল—মা বালি বসাতে গেলেন—আমি সেই সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে তোমার চিঠিখানি পড়লুম। প্রত্যেকটি অক্ষর সুখের বাণ হোয়ে বুকে এসে বিধলো—মৃত্যুর দুয়ারে পা বাড়িয়ে হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠ্‌লো।

জরের ঘোরে দুদিন উঠ্‌তে পারলুম না, চিঠিটার জবাবও দেওয়া হোল না। আজ সকালে জর নেই—সমুদ্রের ধারের জানালাটা খুলে দিয়ে মা জগন্নাথের মন্দিরে পূজো দিতে গেছেন—ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলতে। হায় রে দুরাশা!

সামনে উদ্দাম ঢেউয়ের নৃত্য—সেইদিকে চেয়ে চেয়ে আমার সেই কবেকার চেনা বেণুকে মনে পড়ছে! অম্‌নি চঞ্চলা—ক্ষণে উত্তেজিত অশান্ত সে—তাকে আজ কিছুতেই আমাদের ঘোমটা-পরা শান্ত নম্র বড়বৌ ভাব্‌তে পারছি না। আমায় মাপ কোর।—ঐ অসীম সাগরের দিকে চেয়ে মনে হয়—তুমি আর সাগর যেন এক হয়ে গেছ—তাই দেখ্‌তে সাগরের চঞ্চলতার মাঝে যেন তোমার রূপ, গতি ভঙ্গী দেখতে পাচ্ছি—তাই এই জরাজীর্ণ দেহ শান্তি পেয়েছে, মরবার আগে আর এখান থেকে যাব না বেণু।

যে কথা জিগেস করেছ—যে কথা গোপন করতে গিয়ে তোমার শত ব্যথা দিয়েছি—সে কথা কি আজ তোমায় বল্‌ব? কিন্তু সে যে একান্ত আমার গোপন

কথা—সে যে বাইরের আলো বাতাসের ভরটুকু সইতে পারে না—তাকে কেমন করে আজ প্রকাশ করব। যদি কিছু বেশী বলি, যদি কর্ত্তব্যের পথে একটু হোঁচট খাই—তবে মৃত্যুপথের পথিকের সে প্রগল্‌ভতা মাপ কর। —আজকের সকালের আলোতে বাতাসে আমার বৌদিদির কাছে সে কথা কিছুতেই গুছিয়ে বল্‌তে পারব না—সে আমার শৈশব সঙ্গিনীর কাছে বল্‌ব—অপরাধ নিয়ো না।

তোমাকে ভালবাসি নিজের জীবনের চেয়েও! ঠিক সেই কারণে আমা হতে চিরদিন তোমায় রক্ষে করে এসেছি—তোমার সুখের পথে অন্তরায় হব বলে চিরদিন দূরে থেকেছি। বেণু, তোমাকে দিয়েছি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহার, আমার অশ্রুসরোবরের বুকে ফুটন্ত ভালবাসা—নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পদ্মের মত সুরভিময়ী—কী অপরিসীম বেদনা, কি অসহনীয় সুখ তোমায় ভালবেসে, আজ সে কথা বল্‌ব বেণু!—

প্রথম তালপুকুরের বাড়ী ছেড়ে যখন চলে এলুম তখন শিশু যেমন তার আদরের খেলনাটা ফেলে আস্‌তে কষ্ট পায় আমি তেম্‌নি পেলুম—মনে হোল তোমার উপর আমার অনন্ত অধিকার—তুমি আমার।

তোমায় ছেড়ে এলুম কিন্তু অন্তরে তোমায় ছাড়তে পারলুম না—প্রতিদিন তিলে তিলে তুমি সেখানে তোমার রাজত্ব বিস্তার করে একমাত্র রাণী হোয়ে বস্‌লে।

আমার শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে— আমার দেহে মনে তুমি মিশিয়ে ছিলে বেণু—তোমাকে কিছুতেই দূরে রাখ্‌তে পারি নি। কতদিন কেটে গেল—সেবার আমার আই, এ, পরীক্ষা শেষ হোতেই বাবা পড়লেন ব্যারামে ;—দুর্ব্বল শরীরে আমাকে মানুষ করে তুলবার অর্থ সঞ্চয় করে ভিতরে ভিতরে অনেক দিন থেকেই শক্তি ক্ষয় করছিলেন। প্লুরেসি থাইসিসে পরিণত হোল। আমি ও মা প্রাণপাত করে সেবা করে ঋণে কর্জ্জে ডুবেও বাবাকে বাঁচাতে পারলুম না। তখন তোমার শ্বশুর ও আমার বাবাতে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। তবু একদিন নিরুপায় হোয়ে জ্যাঠামশায়ের দরজায় পড়লুম—জ্যাঠামশায় এলেন—দুই ভাই-এ মিলন হোল কিন্তু বাবা আর সাতটি দিনও রইলেন না। জ্যাঠামশায় মাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন—আমি গেলুম মেসে বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হোতে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সেই সময় একদিন তুমি—আমার অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার একটি মাত্র শান্তির আশ্রয়—এসে আমার সাম্‌নে দেখা দিলে। কেন দিলে?—আমি যে তোমায় ভুল্‌তে চেয়েছিলুম। আমি যে যক্ষ্মারোগীর ছেলে নিঃসহায় কপর্দ্দকহীন দরিদ্র, ভিতরে বাহিরে কাঙাল।

আমার পাশে তোমার স্থান কোথায়? তুমি বড় লোকের একটি মাত্র মেয়ে, সুন্দরী—তোমাকে পাওয়ার আশা আমার দুরাকাঙ্ক্ষা—আমার বাতুলতা! তাই তোমার কাছ থেকে দূরে রইলুম—মনে জানি বাইরে যতদূরে গেছি অন্তরে তত কাছে টেনেছি। তবু তোমাকে হৃদয়ের এতটুকু অনুভূতি প্রকাশ করি নি, পাছে তুমি আমারই মত কষ্ট পাও!—

তোমার বিয়ের ঠিক হোল দাদার সঙ্গে। তুমি আমাদেরই বাড়ীর বড়বৌ হোয়ে এলে! মনে হোল বিধাতার পরীক্ষা এম্‌নি করেই সইতে হয়—প্রাণ যাক্ তবু সইব। বাইরে নির্ব্বাক নির্লিপ্ত হয়ে রইলুম—কিন্তু ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়েছি! এ জীবনব্যাপী যুদ্ধ আর কতকাল করব বেণু?—আজ আমি যক্ষ্মারোগী, মৃত্যুর দরজায় পা বাড়িয়েছি। তুমি আমার বৌদি, আশীর্ব্বাদ কোর যেন শীঘ্রই মরি—মরে তোমাকে সুখী করি।

আমা হতে যেন এতটুকু অশান্তি তোমার না লাগে।

তোমার

ভানুদা

(৩)

ভানুদা,

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি কেবলই কাঁদ্‌ছি! বাপ্-মায়ের আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেও সকলের আদর পেয়েছি- কখনো ত এমন করে চোখের জল ফেলি নি ভাই। আজ আমার অশ্রু-নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে যে।—

কথা—সে যে বাইরের আলো বাতাসের ভরটুকু সইতে পারে না—তাকে কেমন করে আজ প্রকাশ করব। যদি কিছু বেশী বলি, যদি কর্ত্তব্যের পথে একটু হোঁচট খাই—তবে মৃত্যুপথের পথিকের সে প্রগল্‌ভতা মাপ কর। —আজকের সকালের আলোতে বাতাসে আমার বৌদিদির কাছে সে কথা কিছুতেই গুছিয়ে বল্‌তে পারব না—সে আমার শৈশব সঙ্গিনীর কাছে বল্‌ব—অপরাধ নিয়ো না।

তোমাকে ভালবাসি নিজের জীবনের চেয়েও! ঠিক সেই কারণে আমা হতে চিরদিন তোমায় রক্ষে করে এসেছি—তোমার সুখের পথে অন্তরায় হব বলে চিরদিন দূরে থেকেছি। বেণু, তোমাকে দিয়েছি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহার, আমার অশ্রুসরোবরের বুকে ফুটন্ত ভালবাসা—নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পদ্মের মত সুরভিময়ী—কী অপরিসীম বেদনা, কি অসহনীয় সুখ তোমায় ভালবেসে, আজ সে কথা বল্‌ব বেণু!—

প্রথম তালপুকুরের বাড়ী ছেড়ে যখন চলে এলুম তখন শিশু যেমন তার আদরের খেলনাটা ফেলে আস্‌তে কষ্ট পায় আমি তেম্‌নি পেলুম—মনে হোল তোমার উপর আমার অনন্ত অধিকার—তুমি আমার।

তোমায় ছেড়ে এলুম কিন্তু অন্তরে তোমায় ছাড়তে পারলুম না—প্রতিদিন তিলে তিলে তুমি সেখানে তোমার রাজত্ব বিস্তার করে একমাত্র রাণী হোয়ে বস্‌লে।

আমার শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে— আমার দেহে মনে তুমি মিশিয়ে ছিলে বেণু—তোমাকে কিছুতেই দূরে রাখ্‌তে পারি নি। কতদিন কেটে গেল—সেবার আমার আই, এ, পরীক্ষা শেষ হোতেই বাবা পড়লেন ব্যারামে;—দুর্ব্বল শরীরে আমাকে মানুষ করে তুলবার অর্থ সঞ্চয় করে ভিতরে ভিতরে অনেক দিন থেকেই শক্তি ক্ষয় করছিলেন। প্লুরেসি থাইসিসে পরিণত হোল। আমি ও মা প্রাণপাত করে সেবা করে ঋণে কর্জ্জে ডুবেও বাবাকে বাঁচাতে পারলুম না। তখন তোমার শ্বশুর ও আমার বাবাতে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। তবু একদিন নিরুপায় হোয়ে জ্যাঠামশায়ের দরজায় পড়লুম—জ্যাঠামশায় এলেন—দুই ভাই-এ মিলন হোল কিন্তু বাবা আর সাতটি দিনও রইলেন না। জ্যাঠামশায় মাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন—আমি গেলুম মেসে বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হোতে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সেই সময় একদিন তুমি—আমার অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার একটি মাত্র শান্তির আশ্রয়—এসে আমার সাম্‌নে দেখা দিলে। কেন দিলে?—আমি যে তোমায় ভুল্‌তে চেয়েছিলুম। আমি যে যক্ষ্মারোগীর ছেলে নিঃসহায় কপর্দ্দকহীন দরিদ্র, ভিতরে বাহিরে কাঙাল।

আমার পাশে তোমার স্থান কোথায়? তুমি বড় লোকের একটি মাত্র মেয়ে, সুন্দরী—তোমাকে পাওয়ার আশা আমার দুরাকাঙ্ক্ষা—আমার বাতুলতা! তাই তোমার কাছ থেকে দূরে রইলুম—মনে জানি বাইরে যতদূরে গেছি অন্তরে তত কাছে টেনেছি। তবু তোমাকে হৃদয়ের এতটুকু অনুভূতি প্রকাশ করি নি, পাছে তুমি আমারই মত কষ্ট পাও!—

তোমার বিয়ের ঠিক হোল দাদার সঙ্গে। তুমি আমাদেরই বাড়ীর বড়বৌ হোয়ে এলে! মনে হোল বিধাতার পরীক্ষা এম্‌নি করেই সইতে হয়—প্রাণ যাক্‌ তবু সইব। বাইরে নির্ব্বাক নির্লিপ্ত হয়ে রইলুম—কিন্তু ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়েছি! এ জীবনব্যাপী যুদ্ধ আর কতকাল করব বেণু?—আজ আমি যক্ষ্মারোগী, মৃত্যুর দরজায় পা বাড়িয়েছি। তুমি আমার বৌদি, আশীর্ব্বাদ কোর যেন শীঘ্রই মরি—মরে তোমাকে সুখী করি।

আমা হতে যেন এতটুকু অশান্তি তোমার না লাগে।

তোমার

ভানুদা

(৩)

ভানুদা,

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি কেবলই কাঁদ্‌ছি! বাপ্‌-মায়ের আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেও সকলের আদর পেয়েছি- কখনো ত এমন করে চোখের জল ফেলি নি ভাই। আজ আমার অশ্রু-নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে যে।—

তুমি আমায় ভালবেসে কেবল দুঃখু পেলে ভাম্নুদা। একটি দিনের তরেও তোমায় সুখী করতে পারলুম না। এম্নি অযোগ্যকে তোমার বুকভরা ভালবাসা দিয়েছিলে। আমি কি জানি নি তোমার মনের কথা—কত দিন কত রাত তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, তোমার নির্ব্বাক অধর যেন কী বলতে চায়।—তোমার মৌন শান্ত চাহনির বেদনা ঝরে পড়তে দেখেছি—ইচ্ছে হয়েছে—একবার তোমার কাছে যাই। বলি, ভাম্নুদা, এত কষ্ট পেয়ো না—এ যে আমি সহ্য করতে পারি না! কিন্তু তা তো পারি নি। আমি যে পরাধীন, আমি যে অসহায়—স্নেহের শেকলে বাঁধা, সোনার খাঁচার পাখী!

আজ তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ—তোমার কাছে আমায় যেতে দাও, একবারটি তোমার পাশে বসতে দাও! জীবনে কখনো বুঝি তোমার জন্য কিছু করি নি আজ এই শেষ মুহূর্ত্তেই তোমাকে সেবা করে একটু শান্তি পেতে দাও—তোমার দুঃখের একটু ভাগী কর।

তোমার

বেণু

(৪)

বেণু,

তোমাকে কি লিখ্‌ব? তুমি আস্‌তে চেয়েছ? সমস্ত পৃথিবী আমার খুসীতে ভরে উঠেছে। কিন্তু ওগো বন্ধু, এ প্রলোভনকেও জয় করতে হবে—জীবনে যে জিনিষ ঠেকিয়ে রেখেছি দুই বজ্র মুঠিতে বাসনার বুক বন্ধ করে রেখেছি—আজো তাই করব—এখনো সময় হয় নি!

বেণু, তুমি যে মা, আমাদের বংশের দুলালের জন্মদায়িনী জননী—এই ব্যাধির মধ্যে কেমন করে তোমায় টেনে আনি—তোমার ছেলের কল্যাণের জন্যে তুমি দূরে সরে থেকো। কিন্তু আমি ত তোমার দূরে নই বেণু, এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় আমি তোমার পায়ের ধ্বনিটি তোমার আঁচলে বাঁধা চাবির মৃদু আওয়াজটুকু অবধি শুনতে পাই। তোমার দেহ মন, গতি ভঙ্গী, কান্না হাসি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, কিছুই আজ যেন আমার কাছে অজানা নেই!

কত পুরুষ কত নারী আমাকে দেখ্‌তে আসে—তাদেরই মাঝে আমি তোমাকে খুঁজে পাই, তাদের যা' কিছু ভাল—সবই মনে করিয়ে দেয় তোমার কথা। তুমি তো দূরে নেই বেণু, তুমি যে আমার খুব কাছে, একেবারে বুকের মাঝে।

কিন্তু তুমি আস্‌তে চেয়েছ? কি মধুর বেণু, কি মধুর! মরবার আগে এত মধুরতা কে আমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল—তাকে আমার প্রণাম।

তোমার

ভাম্নুদা

(৫)

ভাম্নুদা,

অনেকদিন তোমায় চিঠি লিখি নি—চেষ্টা করেছি তবু পারি নি। হৃদয় মন এমন অবসন্ন, কেবল দেবতার চরণে মাথা খুঁড়ছি! খুড়িমার চিঠিতে জানলুম—তুমি দিন দিনই বেশী অসুস্থ হোয়ে পড়ছ—পাশও ফিরতে পারো না!—ভাম্নুদা, এম্নি করে কেন আমার জন্মে মরছ—না, মর না—এম্নি করে আমায় অপরাধী করে রেখে যেও না! তোমার দাদার চিঠি পেয়েছি, ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছেন—তিনি ফিরে এলে তোমায় নিশ্চয় বাঁচিয়ে তুলতে পারব।

না ভাম্নুদা, তুমি বেঁচে থাকো—আমাদের সংসারে যে তোমার জন্যে গুরুর আসন, দেবতার আসন, দাদার আসন, ছোট ভাইটির আসন পেতে রেখেছি—সে কি এম্নি করে শূন্য করে রেখে যাবে?

বেণু

(৬)

প্রিয়া আমার,

এ সম্বোধন আমার দাদার স্ত্রী, খোকনের মায়ের উদ্দেশে নয়—এ সম্বোধন আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়াকে, মানসীকে, জীবনের ধ্রুবতারাকে!—

তুমি আমায় বাঁচাবে?—তাই বাঁচিও, তোমার অক্ষয় স্নেহ ভালবাসার মধ্যে আমায় বাঁচিয়ে রেখো, মরতে দিও না!

অনন্ত সমুদ্রের ওপার থেকে মরণের পায়ের ধ্বনি ভেসে আস্‌ছে—উজ্জ্বল ঢেউ চঞ্চল হোয়ে বলে উঠ্‌ছে, চল, চল,

চল—তাই যেতে হবে বেণু, আমার তাতে এতটুকুও দুঃখ নেই, আমি তৃপ্ত আমার অনন্ত পিপাসা স্বর্গের অমৃতেও কি মিট্‌বে না!

তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নি। যা পাবার অধিকার নিয়ে আসি নি, যা পাই নি তা চাই নি—আজ কেবল এই অনুরোধ—শেষ অনুরোধ—মৃতের প্রতি করুণা করে আমার মাকে দেখো। দুঃখিনী মা আমার—আমায় হারিয়ে কি নিয়ে থাক্‌বেন! তুমি তাঁকে ভালবেসে সেবা করে আমার কষ্ট ভুলিয়ে রেখ বেণু এই আমার শেষ মিনতি।

প্রিয়া আমার, বন্ধু আমার, আমায় হাসি মুখে বিদাও দাও—না তুমি কেঁদনা, কাঁদ্‌তে পাবে না—তোমার ওই মধুর হাসি কেবল আমার জন্যে রেখ। ওই হরিণের মত কালো চঞ্চল চোখ দুটোতে কি অশ্রু মানায়? সে খুসীতে উজ্জল হোতে উজ্জলতর হোয়ে উঠুক!—

তুমি সুখী হও—দাদাকে সুখী কর! আমার স্মৃতিটুকুও যেন তোমার বেদনার কারণ না হয়, কল্যাণী হোয়ে লক্ষ্মী হোয়ে সংসারকে আনন্দে ভরিয়ে দাও—তোমার ছেলেকে আমার শেষ আশীর্ব্বাদ জানিও।

আমাদের সংসারের বড়বো-এর পায়ে আমার ভক্তির প্রণাম—আমার প্রিয়ার উদ্দেশে জন্মজন্মান্তরের কামনার অশ্রুজল!

তোমার

চির শুভাকাঙ্ক্ষী

ভানু

শেষ

কল্যাণীয়া

বৌমা, আমার সোনার ভানুকে জগবন্ধুর চরণে ধরে দিয়েছি—আশীর্ব্বাদ কোর, ওর মৃত আত্মার সদ্গতি হোক। অল্পবয়সে বাছা আমার অনেক দুঃখ পেয়েছিল—সংসারের তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়েছিল—তাঁর চরণে এখন শান্তিতে ঘুমোক্, দুঃখিনী মায়ের এই কেবল প্রার্থনা।

তোমার জন্যে তার লেখার খাতা ও ডায়েরী বইটা রেখে গেছে আর রেখে গেছে পুরীর কেনা একটি কর্পূরের মালা।

তোমার

খুড়িমা

গ্রাহকগণ কেহ পূজার ছুটিতে অন্যত্র গেলে, ঠিকানা পরিবর্ত্তনের বিষয় নিজ পোষ্টাফিসে জানাইয়া রাখিবেন। আমরা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাতেই কার্ত্তিক সংখ্যা পাঠাইব।

সন্ন্যাসী

শ্রীতারানাথ রায়

এম, এ, পাশ করার সময় সত্যর স্নায়ুগুলির উপর বেশ ধাক্কা লাগে। সত্য বলিত উহা অমনই সারিয়া যাইবে। এক ডাক্তার-বন্ধু উপদেশ দিলেন, এইবার কিছু দিন দেশ হইতে ঘুরিয়া আইস। ওদিকে প্রিয় মাষ্টার মহাশয় বিশ্বেশ্বরবাবু কয়দিন আসিয়া তাহার বাগান-বাড়ী দেখিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

বিশ্বেশ্বর মাষ্টারী করিতেন সে আজ এক যুগ হইয়া গেল। এখন মাষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া সব্জী ও ফলের বাগান করিয়াছেন! পিতামহের আমলের নবাবী থাম ও সিংহ দরজা যুক্ত বিরাট বাড়ীর পলস্তরা খসা দরজা ভাঙ্গা গৃহগুলি ঘেরিয়া বহুবিঘা জমীতে মাষ্টার মহাশয়ের বিরাট বাগান। বাগানের দ্বারদেশে সুদীর্ঘ ও সুপক্ক লাঠি হাতে বাগদী প্রহরী। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল, কোদাল ইত্যাদি হস্তে মজুররা কাজ করে, বৃদ্ধ মাষ্টার মহাশয়ের সর্ব্বদা তদারকে তাহারা ছিলেমটুকু খাইবারও অবসর পায় না।

বিশ্বেশ্বরের সংসারের সম্বল একমাত্র কন্যা। সত্য যেদিন আসিল সেদিন পিতা-পুত্রী উভয়েই মহাব্যস্ত। আমবাগানের মুকুলগুলিকে কুয়াশার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ইংরেজী কেতাবের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছেন, মাধবী নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পিতার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। মাধবীর ধারণা, মেঘলা দিনে কুয়াশা এমন হয় না, তখন কোনমতে মেঘ করিয়া যদি দেওয়া যায় তবেই মুকুলগুলি বাঁচিবে; তাই সে বলিতেছিল পাতা ও খড় জ্বালাইয়া সমস্ত রাত ধূয়া করিয়া রাখা যাক! সত্য আসিতেই বৃদ্ধ বলিলেন—তুই ত আজকাল পণ্ডিত হয়েছিস্ সত্য, আচ্ছা মাধবীর এই যুক্তির কোন সারবত্তা আছে কি না বল দেখি!

সত্য হাসিয়া মাধবীর দিকে তাকাইয়া বলিল—"থাকতে পারে!"

মাধবী সত্যকে লইয়া তাহার ধারণা কাজে পরিণত করিতে গেল! বৃদ্ধ পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে ঈষৎ মস্তক উঠাইয়াই চশমার উপর দিয়া বক্র দৃষ্টিতে বালক ও বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র।

"মাত্র পাঁচ বছর, এর মধ্যে এত বড় হয়ে গেছিস্ মাধবী? আচ্ছা, তোর মনে আছে খেঁদী বলে তোকে খেপাতাম?"

"খু—ব!"

'আর ক খ বলতে না পারলে কশে কান মলে দিতাম?"

"এখন কান মললে আমি বাবাকে বলে দেব ...

সত্য হাসিতে হাসিতে বলিল। আমবাগানের তলায় গিয়া সে পাতা টানিয়া টানিয়া জড় করিতে লাগিল আর মাধবী একদিকে দেশলাই ধরাইয়া দিল। ধূমের জ্বালায় উভয়ে পলায়ন করিয়া সমস্ত বাগান ঘুরিয়া ঘুরিয়া কথা বলিয়া বলিয়া আবার বিশ্বেশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিশ্বেশ্বর এক ক্যাসাভার ফল লইয়া প্রিয়শিষ্য সত্যর অপেক্ষা করিতেছেন। সত্যকে দেখিয়াই বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"এই যে দেখছ বাবা, এই ক্যাসাভা, আমাদের দেশে এর চাষ খুবই বেশী হওয়া দরকার। ও সব দেশে ত দুর্ভিক্ষ হয় না, যদি বা হয় এই ফল খেয়ে তারা বাঁচে। এ থেকে ময়দা ...

মাধবী বাধা দিয়া বলিল—"কি যে তোমার হয়েছে বাবা, সত্যদা এল তার বুঝি আজ খেতে হবে না ...

বিশ্বেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল্ সত্য কেবল উপদেশ শ্রবণ রত মৌন ও মনযোগী ছাত্র নহে, সে ক্ষুধাশীল জীবও বটে। মাধবী সত্যকে খাইতে টানিয়া লইয়া গেল এবং পিতাকেও ডাকিয়া গেল।

ভোজন করিতে করিতেও ভূতপূর্ব্ব মাষ্টার মহাশয় নানা প্রসঙ্গ উঠাইতে লাগিলেন।

"তুমি দেখছ এখানে ঠাণ্ডা, কিন্তু লাঠির আগায় থার্ম্মো-মিটার বেঁধে চোদ্দ ফিট উপরে উঠিয়ে দেখ সিকি ডিগ্রী তাপ বেশী পাবে। কেন বল ত?"

"জানি নে!"

"জান না ... সবই ত একজনে জানতে পারে না, ... তোমার আবার বুঝি ফিলসফিই ছিল?

"সাইকলজিটাই আমি ভাল জানি।"

"মাথা গোলমাল হয়ে যায় না?"

"বরং ভাল লাগে।"

"বেশ বেশ .. খুব ভাল বাবা, খুবই ভাল ... খাইবার পর বিশ্রাম করিতে করিতে হঠাৎ হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া বৃদ্ধ কান পাতিয়া কি শুনিলেন ও তৎপর বরাবর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"বলদ বাঁধ্‌লি ঐ কচি পেয়ারা গাছটার সাথে ... একটা কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না তোদের? মাটি করল গাছটা, ওরাই মাটি করল ...

অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বর সত্যকে বলিলেন—"কিচ্ছু করতে পারবে না বাবা এদের, হতভাগা, নচ্ছার, আহাম্মক সব! আন্‌লি ত গাড়ী বোঝাই করে সার, আর বাঁধ্‌লি বলদ কচি পেয়ারা গাছটার সাথে ... বাকলার তিন জায়গার ছাল উঠে গেছে, বল্লুম, বেটা হা করে ফেল্ ফেল্ করে তাকাতে লাগ্‌ল ... ওর ফাঁসী দেওয়া উচিত।"

বৃদ্ধ আবার ঠাণ্ডা হইলেন—'সত্য, তুই আমায় ভুলিস্ নি! বাবা আমার—বাবা আমার, বলিয়া স্নেহময় গুরু সন্তানের অধিক প্রিয়তম ছাত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সত্য গর্ব্ব অনুভব করিল।

—দুই—

কিন্তু কেতাব তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় বলিতেন, প্রাচীনকালের বিদ্যার্থীদের সবগুণই সত্য পাইয়াছে। পড়িতে পড়িতে তাহার পৃথক অস্তিত্ব বোধ থাকে না। সত্য রাত্রে ঘুমাইত না বলিলেই হয়। দিনে এক আধ ঘণ্টা একটু ঝিমাইয়া লইত মাত্র! যতই রাত্রে ঘুম হইত না ততই দিনের বেলা কাজে তাহার স্ফূর্ত্তি লাগিত।

গাঁয়ে আসিবার দোষেই হোক আর মাধবীর সঙ্গগুণেই হোক সত্য এত বেশী বক্তৃতা ও গল্পবাগীশ হইয়া উঠিল যে, সময় সময় গুরুকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিতে লাগিল। মাধবী মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধ পিতার নিকট বসিয়া মধুর কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিত, কোন সময় বা গাহিত! সত্য তখন ভাব আগে না অভিব্যক্তি আগে তার পণ্ডিতী লড়াই পাঠ করিতে করিতে মাথা তুলিয়া চক্ষু বুজিয়া গান শুনিত, কি চিন্তা করিত তাহা বলা কঠিন। একদিন মাধবীর একটি মেয়ে-বন্ধু বলিল যে, রাতে বাগানের মধ্যে সে বেশ একটা গান শুনিতে পায়, তার সুরটা এত সুন্দর যেন মাধবীর দিদির—"কে এলো কে এলো" গানের মতন। শুনিয়া সত্য পুস্তক হইতে মাথা উঠাইয়া চক্ষু বুজিল। আবার কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া মাধবীকে ডাকিয়া জানালার ধারে লইয়া গিয়া বলিল—"... ঠিক ওমনি একটা গল্প আমার মনে আসচে ... হাজার বছর আগে একটা গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী রাজপুতানার মরুভূমির উপর দেখা গেছল। কয়দিন পর কাছেই এক হ্রদের ধারে কতকগুলো জেলে আর একটা সন্ন্যাসীকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিল। ... এই যে শেষের দেখাটা—বুঝ্‌লে মাধবী—এই শেষের দেখাটা হ'ল মরীচিকা। এই মরীচিকা থেকে আর একটা, তা থেকে আর একটা, তা থেকে আর একটা ... তারপর ছনিয়া ভরাই সন্ন্যাসী ... কখনো চীনে, কখনো আমেরিকায়, কখনো পৃথিবী পার হয়ে, সৌরমণ্ডল পার হয়ে .. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। এ ত হ'ল; কিন্তু আসল বস্তুটা

আমাদের ভুললে চলবে না, সেটা হচ্ছে রাজপুতানার মরুভূমিতে একজন সন্ন্যাসী দেখা গেছল এই ঠিক হাজার বছর আগে একদিন। হতে পারে এই দেখা-যাওয়ার ঠিক হাজার বছর পর আবার সে এখানেও দেখা দিতে পারে ... কি বল মাধবী ?"

সত্যর দৃষ্টি রহস্যাবৃত। মাধবী ওসব বিশ্বাস করিত না। সে বলিল—গাঁজাখুরী!

"তা হ'তে পারে গাঁজাখুরী, কিন্তু আমার মগজে এটা এসেছে যখন তখন এর অস্তিত্ব আজ না থাক্ একদিন ত ছিলই!"

মাধবী তাহাকে এ বিষয়ে সমর্থন করিতে পারিল না দেখিয়া সত্য ভাবিতে ভাবিতে বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। "মেমরী হ'ল মানসিক। আত্মা যদি শাশ্বত হয়, অনন্ত হয় তবে মেমরীও শাশ্বত এবং অনন্ত! কালিদাসের আত্মা যদি আমাতে এসে থাকে তবে কালিদাসের আষাঢ়ের প্রথম দিবসের স্মৃতি আমার মধ্যে কেন থাক্‌বে না!

ফুলগুলি বেশ ফুটিয়াছে, টগর গন্ধরাজ সন্ধ্যামালতী! সূর্য্য বেশ অস্ত যাইতেছে। মালী গাছে জল দিয়া গিয়াছে। তাই ফুলগুলি হইতে একটা কড়া গন্ধ বাহির হইতেছে। দূর হইতে মাধবীর কণ্ঠ শোনা যাইতেছে।

কে এলো—কে এলো—কে এলো! সত্য ভাবিতেছে। মনে করিয়া দেখিতেছে, এই সন্ন্যাসীর গল্প কোথায় পড়িয়াছে না শুনিয়াছে, ভাবিতেছে আর ধীরে ধীরে বাগানের পাশের নদীর ধার দিয়া হাঁটিতেছে। তাহাকে দেখিয়া এক জোড়া হাঁস জলে নামিয়া গেল, সূর্য্য ডুবিয়া গেলেও তাহার লাল আলো নদীর জলে এখনও ঝিলিমিলি খেলিতেছে। নদীর ওপারে মস্ত মাঠ, মাঠ ভরা শ্যামল শস্য। বাড়ী ঘর নাই, এক জন লোকও নাই। মাঠ যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে ঠিক সেই স্থানেই যেন সূর্য্য ডুবিয়াছে।

মুক্ত আকাশ—মুক্ত পৃথিবী—মুক্ত নিস্তব্ধতা, আমি এর তথ্য বুঝে নেব খালি এরই জন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ...

ওপারের শ্যামল খেতের উপর দিয়া একটা ঢেউ খেলিয়া গেল—আর একটা ঢেউ আর একটা। পশ্চাৎ হইতে বাগানের বড় গাছগুলির পাতানড়ার কোলাহল কানে গেল। সত্য অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিল দূরে গগন-কোলে জলস্তম্ভের মতন একটা কি যেন পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। যেন সরিয়া আসিতেছে তাহার কাছে, তাহারই কাছে। সত্য পথ করিয়া দিতে চাহিল, সময় পাইল না ...

স্তম্ভ নয়! সন্ন্যাসী! সব চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, ভ্রূ পর্য্যন্ত। পায়ে খড়ম। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া আবার সেই শ্যামল ক্ষেতের উপর দিয়া দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল।

গল্প নয়—কিছুই গল্প নয়—বাস্তব! সবই বাস্তব!

সত্য বেশ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বাগানে লোক চলাফেরা করিতেছে। মাধবী তখনও গাহিতেছে। চলাফেরা, গাওয়া—সব মিথ্যা! সত্য খালি মেমরী! সে ভাবিল মাধবীকে ও মাষ্টার মহাশয়কে গিয়া সন্ন্যাসীর দর্শনের কথা বলে। কি জানি তাঁহারা যদি অবিশ্বাস করিয়া আবার বলেন, গাঁজাখুরী। চুপ করিয়া থাকাই ভাল। বাড়ীতে গিয়া মাধবীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিতে লাগিল, কাকাতুয়াটাকে বিরক্ত করিতে লাগিল, এমন কি একটা গান পর্য্যন্ত গাহিয়া ফেলিল মাধবীর বন্ধুর অনুরোধে।

—তিন—

সেদিন রাত্রে ভোজনাদি করিয়া সত্য আপনার খাটে গিয়া শুইয়া একখানা পুস্তক খুলিয়া চক্ষু বুলাইতেছে, আর সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতেছে। মাধবী একতাড়া কাগজপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—সত্যদা, এগুলো বাবার লেখা। বাবার লেখা ত পড় নি, পড়ে দেখো কেমন। ...

বিশ্বেশ্বর বাবুও কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বলিলেন —"ওর কথা শুনো না সত্য ... তবে ঘুমের দাওয়াই হিসাবে ব্যবহার করতে পার, অনেক ব্রোমাইডের কাজ করবে।"

সত্য দাঁড়াইয়া মাষ্টার মহাশয়ের জন্য খাটের এক পাশ

পরিষ্কার করিয়া বসিবার স্থান করিয়া দিয়া আপনি সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

"যদি পড়্‌তেই চাও সত্য তবে এই লেখাটা আগে প'ড়ে নিও। তা না হলে অন্যগুলো সম্বন্ধে ভাল ধারণা তোমার হবে না। কিন্তু আজ নয় .. তুমি ঘুমোও ...

মাধবী বলিয়া গেল—'বাবার লেখাগুলো ভাল করে না পড়্‌লে আমি ছাড়্‌চি নে!"

লোকে বলে বিশ্বেশ্বরের বাগানে আধমণে কুমড়ো হয়, একফুট কলা হয়। লোকে বলে বিশ্বেশ্বর বাগান ক'রে বড়মানুষ হয়ে গেল! ...

"বল্‌তে পার সত্য, এই বুড়ো বিশ্বেশ্বর মাষ্টারী ছেড়ে এ সব করল কি জন্য?"

"এও মাষ্টারী!"

"তা বল্‌তে পার! কিন্তু একটা ভয় হয় সত্য, আমার এই সাধের বাগান আমার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি ... দেখ সবই নিজে করি! গাছ ছাঁটা, বোনা—সব। মালীরা সাহায্য কর্‌তে আস্‌লে হিংসা হয়। এ সব করেছি গাছপালা ভালবাসি তাই। কড়া মাষ্টারের মধ্যে এই মধুর ভাবটা এল কোত্থেকে তা তোমায় ভাবিয়ে তুলবে নিশ্চয়। কিন্তু মাষ্টারের কঠিনত্ব তাও ভাল-বাসা থেকেই জন্মে। কিন্তু ভাবি, আমি মলে? কে বা দেখবে! মালীরা কি কাজ করে? কাজ করতে পারে, তবে ভালবেসে দেখবার একজন ...

"মাধবী!"

"হাঁ ও দেখ্‌বে বটে। কিন্তু বয়স হ'ল; কয়দিন আর। শ্বশুরবাড়ী যাবে, বাগান ত আর সঙ্গে যাবে না! বিয়ে হবে, ছেলেপিলে হবে, তাদের নিয়েই সে রইবে ব্যস্ত—আর গাছপালা! জামাইবাবুটির হয় ত এ সব অসভ্য ব্যাপারে মনই উঠ্‌বে না, কাউকে হয় ত বেচে দিতেও পারেন।

"কিন্তু বাবা!" বৃদ্ধ ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

"ছেলে হয়ে তুমিই আমার কাছে থাক না কেন সত্য! আমার মাধবীও রইবে তুমিও রইলে! ...

সত্য লজ্জা পাইল।

"তা আজ ঘুমোও!" বিশ্বেশ্বর যাইতে যাইতে চৌকাঠ পার হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল—"তোমাদের যে টুকটুকে ছেলেটি হবে, দেখো আমি তাকে এক নম্বরের চাষা করে তুলব। ওসব কাগজপত্র নিয়ে আর মাথা ঘামিও না, তুমি ঘুমোও বাবা!

বৃদ্ধের কাগজগুলির মধ্যেও যেন একটা স্নেহ লুকান। সত্য সব লেখা বুঝিল না, তবু প্রত্যেক কালির দাগের মধ্যে একটা বাৎসল্যের চিহ্ন পাইল। ... মাধবী! তা বেশ! কথা বেশী বলে, তর্ক করে! তা বলুক! আর সন্ন্যাসীর কথা সে বলে গাঁজাখুরী! ছেলেমানুষ!

মনে হইল সন্ন্যাসীকে সে একাই দেখিল আর কেহ ত দেখিল না! হয় ত ভুল দেখিয়াছে! কিন্তু তাহাতে কাহার আর কি ক্ষতি হইতেছে! কিন্তু আজ এত আনন্দ কেন একসঙ্গে আসিল? সন্ন্যাসী আর মাধবী! সন্ন্যাসী গল্প ছিল, সত্য হইল। মাধবী বাহিরে ছিল, ভিতরে আসিল।

তখনও ভোর হয় নাই। বিশ্বেশ্বরের খড়মের শব্দ বাগানের দিকে চলিয়া গেল। সত্য ভাবিল, একটু ঘুমাই।

—চার—

পিতা-পুত্রীতে মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত। সেদিনও প্রাতে হইয়া গেল। মাধবী কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ঘরে গিয়া খিল দিল। খাইতে আসিল না। বৃদ্ধ সমস্ত সকালটা মালীদের বকিয়া, মজুরদের জ্বালাতন করিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া খালি তামাক পুড়াইতে লাগিলেন, তিনিও খাইতে গেলেন না। তামাক টানিয়া টানিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্বেশ্বর উঠিয়া গিয়া ডাকিলেন—"মা! মাগো!"

মাধবী জবাব দিল না। হয় ত কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে। সত্য খালি কেতাব লইয়া কি মাথা মুণ্ড ভাবিতেছে। বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন—"দেখ ত বাবা সত্য! তুই যদি পারিস্।"

সত্য গিয়া মাধবীর দরজায় ঘা দিল। তাহাকে ঠাট্টা করিয়া, জ্বালাতন করিয়া দরজা খুলিতে বাধ্য করিল, এমন কি জানাইয়া পর্য্যন্ত দিল যে, মাষ্টার

মহাশয়ের কথানুসারে এখন হইতে মাধবী সত্যর সম্পত্তি। মাধবী সেদিন সত্যদাকে সত্যদা বলিয়া ডাকিয়া সে থালি—"যান্ আপনি ভারী দুষ্টু!" বলিয়া পিতার নিকট গিয়া সব ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল বৃদ্ধ কন্যাকে পাতা চিরিয়া কি সব তথ্য বুঝাইতেছেন।

সন্ধ্যা বেলা দূর হইতে কে যেন গাহিতেছে শোনা গেল। সত্য বাগানের মধ্যে একখানা বেঞ্চে বসিয়া মাঝে মাঝে সম্মুখের সবুজ মাঠ দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল, বাহ্য বিষয় বা ষ্টিমুলিগুলি আমাদের চোক-কান-নাক এমন কি মন পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছে, না বাহজগতের অস্তিত্ব খালি মনের কল্পনায়। গানের সুর কানে যাইতেই মনে পড়িয়া গেল সন্ন্যাসীর কথা। পাশে তাকাইয়া দেখিল একটা কে যেন সেই বেঞ্চে তাহারই পাশে বসিয়া। শাদা মুখ, শাদা চুল। সত্য জিজ্ঞাসা করিল—"সন্ন্যাসী?"

সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল মাত্র।

"তা তুমি ত ছায়া, এখানে এসেছ কেন? ...

"ডাকলে, তাই এলুম!"

"কে তুমি?"

"তুমিই জান!"

"কোথায় থাক?"

"তোমার কল্পনায়? কল্পনা তোমার প্রকৃতির বাইরে নয়, কাজেই আমিও প্রকৃতির বাইরে নই।"

"আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রয়েছ যে, আমায় ভাল লাগে?"

"হাঁ লাগে। সত্যের সন্ধানে তুমি কত চিন্তা নিয়ে ছুটেছ ..."

"সত্য পাব?"

"পাবে বই কি!

"কিন্তু জন্ম-মৃত্যু যে রয়েছে!"

তুমি অমর ··· মানুষ মরে না। তুমি বড় হবে, যশস্বী হবে। তোমাদের মতন নরোত্তম না জন্মালে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লোপ পেয়ে যাবে। তোমরা সত্যকে অভিব্যক্ত করেছ ..."

"তোমায় আমার বড় ভাল লাগে! ..."

"আমারও তোমায় বড় ভাল লাগে।"

"কিন্তু তুমি যে চলে যাও—তুমি যে মরীচিকা ছায়া? তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ব না ত?"

"না—না—না"। ক্রমশঃ এই 'না' নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, এই 'না' সুস্পষ্ট হইতে ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইতে লাগিল, ছায়া মিলাইয়া গেল। সত্য ফিরিল। অন্তর তাহার মহা উত্তেজনায় ভরিয়া গেল। সে সত্যের ঋষি—তাহাই ত সন্ন্যাসী বলিয়া গেল!

মাধবী আসিয়া বলিল তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে হয়রাণ হইয়া গিয়াছে। মাধবী আসিয়া দেখিল সত্যের মুখে চোখে কি একটা আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—

"আজ আমায় আপনার সাইকলজী বুঝাতে হবে।..."

"তা বুঝাব—নিশ্চয় বুঝাব।"

"আপনার ঐ বিদ্রোহী চুলগুলোকে কাল আমি নাপিত ডেকে ভাল করে কাটিয়ে দেব কিন্তু ..."

"তা দিও!"

—পাঁচ—

মাধবীর বিবাহে বিশ্বেশ্বর কলিকাতা হইতে গোরার বাজনা আনাইয়াছিলেন, আশে পাশের দশ গাঁয়ের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি আকর্ষণ যতই মাধবীর বেশী হইতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল পিতার প্রতি নজর যেন সে কম দিতেছে, ততই মাধবী পিতার প্রতি যত্ন বেশী লইতে লাগিল, সময় সময় তাহাতে একটু যে আতিশয্য পরিলক্ষিত হইল না তাহা নহে। বৃদ্ধ কন্যার উপর অধিক অভিমান করিতে থাকিলেও কন্যা তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া নরম হইয়া পিতার মনঃস্তুষ্টি সম্পাদনের চেষ্টা করিতে থাকিত।

সত্য সহরে ফিরিয়া গিয়াছে। মাধবীর সহর ভাল লাগিতেছে না। সত্য খালি পড়িত আর তাহার সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া কেবল উপরের দিকে চাহিয়া কি সব ছাই মাথামুণ্ডু ভাবিত। সময় সময় ঘুমন্ত অবস্থাতেও কি সব কথা সত্য বলিত।

রাত তিনটা। বাতী নিভাইয়া সত্য শুইল। চোখ

বুজিল, ঘুম আসিল না, খুব গরম। ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজিল। সত্য উঠিয়া বাতী জালিয়া দেখিল সন্ন্যাসী তাহার ইজিচেয়ারটার হাতলের উপর বসিয়া আছে।

"কেমন আছ—কি ভাব্‌ছ ?"

"ফরাসী বইটাতে পড়্‌লাম যে, এক যুবক বৈজ্ঞানিক ছিল, সে কেবল চাইত যশ, আমার যেন যশ ভাল লাগে না।"

"কারণ তুমি জ্ঞানী। তোমার স্তুতিগাথা সমাধির ফলকে খোদা রইবে, কাল তা মুছে দেবে ..."

"আচ্ছা সুখটা কি ?"

পাঁচটা বাজিল। মাধবী ঘুমের মধ্যে তাহার হাতখানা সত্যর বুকের উপর ফেলিল। সত্য তাহা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"আমার এত সুখ .."

"সুখই ত স্বর্গ।"

মাধবীর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল স্বামী চেয়ারটার সঙ্গে কথা বলিতেছে, হাসিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে সে ভয়ে তাকাইল।

"কার সাথে কথা বল্‌ছ ?"

হাত নাড়িয়া সন্ন্যাসীকে কি বলিতে যাইতেছিল, মাধবী সে হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"কার সাথে কথা বল্‌ছ ? কেউ ত নেই, কেউ ত নেই ..."

সত্য একবার স্ত্রীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া ফিরিয়া দেখিল সন্ন্যাসী চলিয়া গিয়াছে—"হুঁ। কেউ নেই ..."

"তোমার অসুখ করেছে ..."

সত্য একটু হাসিয়া লইল মাত্র। মাধবী পিতাকে টেলিগ্রাম করিল। বিশ্বেশ্বর আসিয়া ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী ভরিয়া ফেলিলেন। সত্য মাত্র একটু হাসিল।

—ছয়—

ডাক্তার আসিল, ওষুধ আসিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য একটু ফিরিয়া আসিল। এক বৎসর গেল দুই বৎসর গেল, কিন্তু সন্ন্যাসী আর আসিল না। কয়দিন হইল তাহারা বিশ্বেশ্বরের বাগান বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সত্য সেই নদীর পারে গিয়া দাঁড়াইল, শ্যামল মাঠের দিকে তাকাইল, সূর্য্য যে ডুবিয়া গেল তাহাও দেখিল কিন্তু সন্ন্যাসী ত আসিল না।

পরিবর্ত্তে মাধবী আসিয়া বলিল—"দুধ খাবার সময় হয়েছে, চল।"

"না, হয় নি, আমি খাব না—তুমি খাও গিয়ে।"

মাধবী সত্যর ঈষৎ ক্রুদ্ধ মুখের দিকে একবার তাকাইল, "এমন করে তোমরা আমায় কেন জালাতন করছ ?" আবার সত্য সম্মুখে তাকাইয়া দেখিল অন্ধকার আসিতেছে, সন্ন্যাসী আসিতেছে না।

বাড়ী ফিরিলে বিশ্বেশ্বর বুঝাইয়া দুধ খাইতে অনুরোধ করিল—সত্য রাগিয়া গিয়া বলিল—"আপনার বুদ্ধদেব, মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট এঁরা ব্রোমাইডও খেতেন না, আর দিনে সাতবার দুধও খেতেন না।"

বিশ্বেশ্বর কথা কহিলেন না। বিষণ্ণ হইলেন। সত্য মাধবীর সেবা লইত না! শরীর ক্রমশঃ আবার খারাপ হইয়া আসিল। শেষে ব্যাপার এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, সত্য মাধবী ও তাহার পিতাকে এক রকম ঘৃণাই করিতে লাগিল। মাধবীরও মনে হইতে লাগিল সত্য কদাকার, পাগল! উন্মাদ!

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ বক্তৃতা সত্যকে মুলতুবী রাখিতে হইল স্বাস্থ্যের জন্য। শরীর খুবই অসুস্থ। সন্ন্যাসী আসে না। একদিন এক আধটু রক্তও উঠিল। সত্য রক্ত দেখিয়া ভয় পাইল না। তাহার মায়েরও রক্ত উঠিত। তবু তিনি দশ বার বছর বাঁচিয়াছিলেন। তাহার পর ডাক্তাররাও বলিতেছেন—ভয় নাই। কেবল তাঁহারা বলিতেছেন—কথা একটু কম বলিতে আর একটু স্ফূর্ত্তিতে থাকিতে।

একদিন অসহ্য হইয়া মাধবী এমন কলহ বাধাইয়া তুলিল যে, বিরক্ত হইয়া সত্য বিশ্বেশ্বরের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

—সাত—

... ছিল এক পিসী। সত্য রাগ্‌ মুড়ী দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াই পিসীকে বলিল—"বিছানা করে দাও!"

সেই বিছানা ছাড়িতে সত্যর সর্ব্বদা ইচ্ছা হইত

কিন্তু সে ছাড়িতে আর পারে নাই। রাত্রে ঘুম নাই। চিন্তারও শেষ নাই। হতভাগা বুড়ো মাষ্টারটাই তার সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিয়া দিল, আর লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা পাগল বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়া পৃথিবীর কাছে তাহাকে ছোট করিয়া দিল। তবু মাধবীর কথা তাহার মনে পড়িত। বার বার নিবারণ করিতে চাহিয়া সন্ন্যাসীর কথা জোর করিয়া যতই মনে তুলিতে চাহিত ততই মাধবী পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

সন্ধ্যাবেলা ডাক হরকরা চিঠি দিয়া গিয়াছে। মাধবী চিঠি দিয়াছে। চিঠি কে চাহিয়াছিল? সে তাহার চিঠি চায় না। কাঁদুনি চোখের চাহনি দিয়া সে তাহাকে কঙ্কাল করিয়া ফেলিয়াছে! আবার চিঠি কেন!

উপরে চাঁদ। দূর হইতে ভিজা মাটীর একটা গন্ধ বহিয়া আসিতেছে। সত্য কোন মতে আপনাকে টানিয়া লইয়া জানালার কাছে আনিল। নীচে কাহারা গল্প করিতেছে—শব্দ করিয়া হাসিতেছে। হয় ত উহারা খেলিতেছে। সত্য জোর করিয়াই যেন চিঠি খুলিল। মাধবী লিখিয়াছে—

"বাবা এই মাত্র মারা গেলেন। তুমিই তাঁকে খুন করলে। বাগান মাটি হয়ে গেছে। ভিন্‌দেশের লোক মালেক—বাবা যা ভয় করতেন তাই হল। এও তোমার কৃপায়। অন্তর থেকে তাই তোমায় ঘৃণা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভেবেছিলাম তুমি পণ্ডিত—দেখ্‌লাম তুমি একটা বদ্ধ পাগল, উন্মাদ। এই কথাটাই ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য কাল তোমায় একবার দেখে আসব ..."

চিঠিখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া সত্য তাহা ফেলিয়া দিল। তাহার ভয় করিতে লাগিল। মাধবী অভিশাপ দিয়াছে, বলিয়াছে—পৃথিবীতে তাহার সুখ হয় ত তাহাকে দেখিতে হইবে না। ভয়ানক ভয় করিতে লাগিল, হামাগুড়ি দিয়া দিয়া মেঝে হইতে অতিকষ্টে কম্পিত হস্তে চিঠির টুকরাগুলি কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল—মাধবী অভিশাপ দিয়াছে—মাধবী—মাধবী—বড় ভয় করিতে লাগিল। সত্য ভয়ে চক্ষু বুজিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"পিসী! ও পিসী!"

পিসী আসিল না। পরিবর্ত্তে জানালার ভিতর দিয়া এক ঝাপটা বাতাসের সঙ্গে প্রবেশ করিল—সন্ন্যাসী!!

"ভয় পেলে সত্য? তুমি কত বড়, দুনিয়া কত ছোট, তবু ভয় পেলে?"

সত্য ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সন্ন্যাসীর ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। কথা বলিতে চাহিল, কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না, বাহির হইল এক ঝলক রক্ত। ইচ্ছা হইল পিসীকে ডাকে—অনেক চেষ্টার পর মুখ দিয়া জোরে বাহির হইয়া আসিল—"মাধবী!"

মুখ মাটিতে গুঁজিয়া গেল, মাথা উঠাইয়া সন্ন্যাসীর ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া সত্য আবার ডাকিল—"মাধবী!"

মাধবীকে ডাকিল, ডাকিল সেই মাষ্টার মহাশয়ের সঁপিয়া দেওয়া সাধের বাগানটিকে, ডাকিল তাহার প্রতি পাদপকে, ডাকিল নদীর পারের শ্যামল মাঠকে, ডাকিল তাহার প্রাণকে, আশাকে, আদর্শকে। জবাবে আর এক ঝলক লাল রক্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বিছানা রাঙা করিয়া দিল। ভোর বেলা রাখালদের মেঠো রাগিনী শুনা যাইতে লাগিল।

মাধবী আসিয়া দেখিল একটা গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী তাহার স্বামীকে আগুলিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সত্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রক্তমাখা মুখে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মাধবী ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল। সত্য খালি একবার তাহার সুন্দর মুখের দিকে আর একবার সরিয়া-যাওয়া সন্ন্যাসীর ছায়ার দিকে তাকাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী মিলাইয়া গেল। সত্য মাধবীর মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিল।

---

* চেখভের "The Black Monk" হইতে

বিধাতার মত ভাই

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঠুন্‌কো কাচের বাসন বানাই
বিধাতার মত ভাই,
খেলো বেলোয়ারি যত চুড়ি ;
ঘি'র দীপ জ্বেলে ফুঁ দিয়ে নিভাই
বিধাতার মত ভাই,
সংসারে করি রংদার যত রাংতার কারিগুরি ।
নাম রাখি ভালোবাসা,
চোখের পানিতে বাসি পচুমের পিদীম রয়েছে ভাসা ॥

ভুখের উনানে পরাণ উনাই
বিধাতার মত ভাই,
যত খুসি বেচি ভুসি মাল ;
খুঁয়ে তাঁত হয়ে গরদ বুনাই
বিধাতার মত ভাই,
তছ্‌নছ্‌ করি দোকান বেসাতি, করি সবি পয়মাল ;
ভেজাল আড়তদার—
ঘসা পয়সা ও সিসের সিকিতে করি যত কারবার ॥

ভণ্ডুল করি, কঞ্জুস মোরা
বিধাতার মত ভাই,
ছেঁদো কথা গেঁথে গাহি গান ;
দিলদার নই, দিলগির মোরা
বিধাতার মত ভাই,
ছর্‌কোট করি, চিরকুট পরে থাজা-খা গাদয়ান ;
কাজ নাই, গড়ি তাজ,
ধস্‌কা মহল ধ্বসে পড়ে,—মোরা গরীব, ফেরেব্‌বাজ ॥

জুনাবালী

[পাড়াগেঁয়ে মুসলমান মেয়েদের বিয়ের একটি গান]

জসীম উদ্‌দীন

শিশুকালে জোনাবালীর বিয়ে হয়েছে। ভিন্‌গাঁর এক শিশু-বর এসে কবে যে তার গলে বিয়ের মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে তা তার মনেও নেই। কি জানি ঘুমের ঘোরে কোন্ মদনকুমার কবে এসে তার কপালে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে গেছে। ছেলেবেলার পুতুল খেলার ঘুমে সে কি তা বুঝেছিল?

তারপর নববরষার কদম্ব-কোরকের মত কৈশোরের লাবণ্য তার সারা গায়ে শিউরে উঠল। তখনও খেলতে মন যায়। সাথীদের সাথে পুতুল বিয়ে দিতে হয়। বাড়ীর বাইরে বুনো গাছগুলোর তলে তাদের খেলার হাট বসে। মায় বকে বাপে শাসন করে। পালিয়ে পালিয়ে সে পুতুল-বিয়ের গান গায়। সাথীরা অভীযোগ করে, "হালো, তোর গলা আর তেমন ওঠে না কেন?" জুনা চুপ করে থাকে।

একে একে জুনার সাথীদের বিয়ে হয়ে গেল। বেলয়ার বিয়ে হ'ল উজানী নগরের শঙ্খ সাধুর সাথে। তারা শাখের ঘাটে পা মেলে মুক্তোর ঘাটে বসে গল্প করে। ময়নামতীর বিয়ে হ'ল ওলইডাঙ্গার কাঞ্চন সাধুর সাথে। তারা লবঙ্গ লতার কুঞ্জের ঘাট বিছিয়ে কর্পূর পাতার বাতাস নেয়।

জুনা একা একা খেলতে পারে না। বুক ফেটে যায় কান্নায়। পুতুলগুলো সব পড়ে আছে। কার সাথেই বা বিয়ে স্থায়, আর কারাই বা সেই বিয়ের গান করে।

ময়না স্বামীর ঘর হ'তে ফিরে এল লবঙ্গফুলের গন্ধ ছড়িয়ে, বেলয়াও এল শঙ্খের রথে পথের সাদা ধূলো উড়িয়ে। ময়নার জন্যে শ্বেতদ্বীপ হ'তে তার স্বামী মুক্তোর মালা এনে দিয়েছে। সে তা খুব ঘটা করে তাকে দেখাতে এল। বেলয়াও এলো তার 'গঙ্গাজলি' শাড়িখানার আঁচল ঘুরাতে ঘুরাতে, যেন সে দেখাতে চায় জুনার স্বামীর কি সাধ্য আছে এমন শাড়ী জুনাকে স্থায়।

সখীরা চলে গেলে। জোঃমন্দির ঘরের কপাট এঁটে জুনা ভাবতে বসল। একা একা জুনা ভাবতে বসল। আরসী-খানা সামনে নিয়ে জুনা ভাবতে বসল। বর! বর!! বর কেমন? তার সুন্দর মুখখানা আরসীর বুকে ফুটে উঠল—দীঘির নীল স্বচ্ছ জলে যেন সোনার পদ্ম। মেঘের মত কাল 'কেশ সিঁথীর দুপাশে এলিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে কপালের ওপরে সিঁদূরের ফোঁটা। জুনা ভাবে তার বর কেমন?

ছেলেবেলায় তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কোন স্মৃতিই তার মনে নেই। শুধু কপালের ওই একবিন্দু সিঁদুরের রেখা। তার বরের রাঙাপায়ের দাগের মত কপালের কাল চুলের গুচ্ছ সরিয়ে হাসে। জুনা ভাবে তার বর কেমন?

স্বচ্ছ আরসীর বুকে জুনার সোনার মুখখানি ভাসে। তখন—

হাপন মুখ কাটিয়া জুনা স্বামীর মুখ বানায়,
বুকের চাম ছিঁড়িয়া জুনা স্বামীরে সাজায়।

নিজের মৃণাল বাহুখানি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আরসীর বুকে ধরে, কেমনটি হ'লে তা তার বরের বাহুখানির মতন

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে জুনাবালী শব্দের অর্থ তরুণী।

দেখাবে। এমনি করে নিজের রূপদিয়ে স্বচ্ছ আরসীর বুকে তার না-দেখা বরের দেহখানি মনে মনে সাজায়।

দিন যায় সাঁঝ হয়। সাঁঝও যায় রাত আসে। ভাবতে ভাবতে জুনা ঘুমিয়ে পড়ে। মূক আরসী এই গেঁয়ো বিরহিনীর মূর্ত্তি বুকে এঁকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

জুনার খাওয়া ভাল লাগে না। বেড়ান ভাল লাগে না। তার মন বলে, তার বর একদিন আনবেই আসবে।

জুনা 'পঞ্চ ব্যাঞ্জন' রেঁধে ভাত বেড়ে একা জোড় মন্দির ঘরে বসে থাকে। আঁচল পেতে বসে বসে চিকন গুয়া কাটে। রাত আর কাটে না। জুনার দুঃখের রাত আর কিছুতেই কাটে না। জুনা একা একা বসে গান করে। গভীর রাত তার সুরে সুরে শিউরে ওঠে। জুনা গায়—

রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে।
বেলা গেল সন্ধ্যা হৈল—ও হৈল রে—
গৃহে জ্বলে বাতি
রান্ধিয়া বাড়িয়া অন্ন জাগব কত রাতি রে।
রাইত না এক পরের[১] হৈল—ও হৈল রে—
ফাটে বুকের ছাতি
না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাইতি রে।
রাইত না দুই পরের হৈল ও হৈল রে
জোরে বহে হাওয়া।
অঞ্চল বিছায়ে নারী কাটে চিকন গুয়ারে[২]।
রাইত না প্রভাত হৈল—ও হৈল রে—
কোকিল করে কুয়া
খুইলে স্তাও মন্দিরের ক্যাওর[৩] লাগুক শীতল
হাওয়া রে।

এমনি তার বিরহের রাত কাটে। দিনে—

বাড়ীর সামনে বট বিরিক্ষি ঝলমল ঝলমল পাতা
তারির কাছে জানায় কন্যা হাপন মনের ব্যথা।

ভিন দেশের এক বণিকের ছেলে পথে যেতে যেতে এই বিরহিনী নারীর কান্না শুনে গেল।

২

বট না বিরিক্ষির তলে মা-ধন কে কান্দন করে
সে কান্দন না শুনে আমার মন ত পালায় ঘরে॥

মা একে একে ছেলের কাছে সব কথা শুনলেন। সে কোন্ গাঁয়ের মেয়ে, কেমন জায়গায় বাড়ী, কেমন চেহারা তার,—সব। শুনে মা চিনতে পারলেন এ তো আর কেউ নয় তাঁরই পুত্রবধূ। তখন মা বললেন, এই কন্যার সাথেই তোমার বিয়ে হয়েছে।

"শিষ্যকাল[৪] গ্যাছে সোনার পুতরে বয্য, কাল আইছে
এই যৈবনের ভার হা রে পুতরে সেই কান্দন কান্তেছে।"

ছেলের মনে ভারি ব্যথা লাগল। একবার দেখে এলে হয় না তাকে? কিন্তু কি করেই বা লজ্জায় মাকে এ কথা বলা যায়? কিন্তু মা তখনই আদেশ করলেন—

তুমি ত না যাইও পুত রে সেই জুনার বাসরে।

ছেলে সেকালের ছেলে। মা-বাপের আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। মাটীর দিকে মুখ রেখে কোন রকমে উত্তর করল—

আমি ত না যামু[৫] মা ধন সেই জুনার বাসরে।

মা ছেলের ব্যথা বুঝলেন না। দিন যায়। বট বিরিক্ষির তলে সেই 'আওলায়া মাথার ক্যাশ ফেরে পাগলিনী বেশে' মেয়েটির কথা মনে পড়ে। সব কাজের মধ্যে ছেলে আনমনা। দশমণ লবঙ্গ মাপ্‌তে যেয়ে আটমণ মাপে। এক কাহণ কড়ি গুণতে ভুল হয়ে যায়। সোনার দরে রূপো গুণে। রূপোর দরে কড়ি মাপে। মা সব টের পেলেন।

এতদিন ছেলে-বউ ছোট ছিল। তাই কারও সাথে কারও দেখা হ'তে দেন নি। আজ বুঝলেন যৌবনের দেবতা তার বাঁশী বাজিয়ে এই দুটি অন্তরের ভালবাসাকে

১। একপরের—এক প্রহরের। ২। কাটে চিকন গুয়া—খুব সরু করে সুপারী কাটা। পূর্ব্বে চিকন সুপারী কাটা মেয়েদের একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল। ৩। ক্যাওড়=কওড়=কপাট। ৪। শিষ্যকাল=শিশুকাল ৫। যামু=যাব।

আজ এক জায়গায় টানছেন। মা ছেলেকে বললেন, হ্যা রে একদিন বউ দেখে আয় না। কিন্তু—

সাঁঝ রাইতি যাবা পুত রে মোরগ ডাকে আইস। তখন ছেলে 'কুচা' ছলিয়ে ফুলছাতি উড়িয়ে শ্বশুরবাড়ীর দেশে রওয়ানা হ'ল। এ গাঁও ছাড়িয়ে ও গাঁও পেরিয়ে খেয়া ঘাট। ঘাটের মাঝিকে এক কড়ার কড়ি দিয়ে পার হলেই জুনাবালীর দেশ। সেখানে যেতেই নগরিয়া লোকে তাকে চিনতে পারল। তারা ওঠে কি বসে, বসে কি ওঠে এমনি করে জুনাবালীর কাছে যেয়ে উপস্থিত হ'ল।

খবরিয়া খবর করে জুনাবালীর আগে,
শোন শোন ও হ্যা রে জুনা কয়া বুঝাই তোরে,
বাইর হয়া ছাখ্ আরে জুনা,
তোর জামাই আইছে দেশে

তখন জুনা 'আলু থালু' বেশে—

ডাইন হস্তে পানির ঝারি বাম হস্তে গামছাখান নিয়ে
পা ছুখানি ধুয়া রে জুনা মাথার ক্যাশ দ্যা মুছে।

এমনি করে করে মাথার কেশে স্বামীর সুন্দর পা ছখানা মুছিয়ে জুনা তাকে জোড়মন্দির ঘরে চন্দন কাষ্ঠের পিড়েয় বসিয়ে উড়কীধানের মুড়কি দিয়ে, বিন্না ধানের খই, গামছা বাঁধা দই আর নয়া গাছের সবরী কলা দিয়ে জলযোগ করাল। তারপর স্বামীকে মেয়ারেণু মাখান খয়েরে পান সেজে দিয়ে রান্না করতে গেল। এতদিন পরে আজ স্বামী এলেন। জুনা ঘটা করে রান্তে বসল। ছানা-বড়া, পিঠা পায়েস জুনা কত কি তৈরী করল। এমনি করে 'এক পহর রাইত গেল জুনার রান্ধতে বাড়িতে।' তারপর 'ছুইও পহর রাইত গেল জুনার খাওয়াইতে নওয়াইতে'।

স্বামীর খাওয়া হলে জুনা অষ্ট অলঙ্কার পরতে বসল। প্রথমে সুবর্ণের পেটরা খুলে নানান রকমের শাড়ি বের করল। একখান পরে মনের মত হয় না! খুলে ফেলায়। আবার আর একখানা পরে। এমনি করে 'গঙ্গাজল' 'হিত' 'মেঘডম্বুর'—কত শাড়িই জুনা পরল। কোন খানই মনের মত হয় না। সব শেষে পেটরার একপাশে গুলাল কাঠের কৌটা খুলে জুনা একখানা শাড়ি বের করল—

নামে তার হিয়া
সেই শাড়ি পরিয়া হইছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া।

চল্লিশ কন্যার বিয়া যে শাড়িতে হয়েছে সে শাড়ি কার না মনমত হয়?

সেই শাড়ি লইয়া কন্যা পিনল বড় ঠাটে
নিমা সামের কালে যেমন সূয্য রইল পাটে।

তারপর—

একে ত আবের কাঙ্কই চন্দনের ফোটা
চিরলে চিরিয়া কেশ করল গুটা গুটা।
চিরলে চিরিয়া কেশ বামে বান্ধে খুপা
খুপার উপর তুইলে দিল গন্ধরাজ চাঁপা।

খোপা বাঁধা শেষ হ'লে—

খিল খাড়ুয়া বাকমুড়া পায়েতে পাশলি
বনমালা চন্দ্রহার গলাতে হাসলী;

পরল। তারপর—

শীষেতে সিন্দুর পরে রক্তের ধারা
নয়ানে কাজল পরে শশী কুলের তারা।
কাজলে মাজিয়া আঁখি অরুণ ছুটি ফুল
আলো দেয় চন্দ্র যেন হাতের দশাঙ্গুল।

এমনি করে—

তিন পহর রাত গ্যাল জুনার সাজিতে গুজিতে।

পূবের চন্দ্র তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। এতদিন পরে আজ স্বামীর সাথে দেখা। কত কথা জুনা মনে করে রেখেছে। কি ভাবে একটু মান করে থাকতে হবে কি ভাবে শেষে আলাপ জমবে, সব।

জুনা ঘটা করে ফুলশয্যা বিছাতে বসল। জরীর কাজ করা মখমলের চাদর, আকন্দ তুলার বালীশ, চন্দন কাষ্ঠের পালঙ্কে জুনা খুব সুন্দর করে সাজাল। তারপর কদম্ব ফুলের রেণু এনে সারা বিছানায় ছড়িয়ে দিল। এমনি চাইর পহর রাইত গ্যাল জুনার ফুলশয্যা বিছাইতে;

এন সময় দারুণ কোকিল হা রে রাও[১] ভাল করে
এন সময় দারুণ মোরগ হা রে ডাক ছাল দিল।

১ রাও—শব্দ।

তখন স্বামী এসে জুনাবালীকে বলছে—

শোন শোন ও আলো জুনা আরে কইয়া বুঝাই তোরে
মায়ের ছিল সত্য কড়াল[১] পালন কইরা আসি।

একে একে সাধু সব কথা জুনাবালীকে বলল। তার মায়ের আদেশ প্রভাতের মোরগ ডাকিতেই তাকে শ্বশুর বাড়ী ছাড়তে হবে। জুনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। নিশ্চল পাথরের মত জুনা দাঁড়িয়ে রইল। কোন আপত্তি করল না। শাশুড়ীর এই নিষ্ঠুর আদেশের জন্য কোন অভিযোগ করল না। এতদিন পরে যে স্বামী আজ একটা মুখের কথা না বলেও বিদায় নিয়ে যায় সেই স্বামীকে সে একটি কথা বলেও যেতে নিষেধ করল না। শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত তার বুক-ফাটা কান্না গুমরিয়ে উঠল।—

নিব্যার[২] ছিল মনের আনল সাধু[৩] জালাইয়া গেলা।

সাধু চলে গেল। সেই শূন্য মন্দিরে জুনা একা লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে বসল। তখন শিয়রের সারি সারি সহস্র মোমের বাতি জলে জলে শেষ হয়ে এসেছে।

———

ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি
স্মরণ-অতীত সৃষ্টি-দিনের এনেছে গোপন বাণী।
তিনদিকে এর ঘিরে' আছে ঘুরে' ঝক্‌ঝকে নদীজল
শত শত ডিঙি ভিড়িয়াছে কূলে, দুলিতেছে ছল্ ছল্
—মাঝি মাল্লার লেগে গেছে ব্যস্ততা,
চৌদিকে জাগে কলগুঞ্জন, হাজারো রকম কথা,
জাহাজ-ঘাটায় জমিয়াছে লোক, 'ভেপাল' বাহিছে জেলে
ওপারে সবুজ তরুপল্লব সবুজের যাদু মেলে'—
দিকে-দিকে জাগে অসীম কৌতূহল,
সৃজন-প্রাতের রহস্য-লীলা ঘিরিছে এ তটতল।

জলবুকে যেন মায়া দ্বীপের মত'
জেগে আছে এই বন্দরখানি, স্বপন-মাখানো কত'!
ঘুম থেকে যেন সহসা জেগেছে—নয়নে স্বপন লেগে,
আকাশ হেসেছে শঙ্খ-ধবল মেঘে,—
ছবিগুলি যেন প্রাণের পরশে দুলে' ওঠে রূপ নিয়ে
ঘুম টুটে হাসে সারা কূলখানি আলোক-অমিয়া পিয়ে।

—কত দিক্ হতে কত না তরণী বেয়ে,
—কুতূহলী যত আঁখির আলোকে কূলখানি ফেলে ছেয়ে।
ইহারে ঘেরিয়া মেলেছে আজিকে বিরাট্ প্রাণের লীলা,
কাশফুলগুলি দুলিয়া পাগল,—চমকে আকাশ নীলা।

দীর্ঘ দীর্ঘ কাঠগুলি ফেলা—গজারী সুঁদুরী শাল,
উহারি উপরে লাফালাফি করে অধীর ছেলের পাল,
—নতুন জাগার চমক লেগেছে,—লেগেছে ওদের প্রাণে,
চৌদিক্ তাই তোলপাড় করে মহা হুল্লোড়ে গানে।
—প্রাণের লীলায় উতলা হ'লো রে, অধীর হ'লো রে দিক্,
আকাশের সারা বুক কেঁপে আলো উছলিছে ঝিক্‌মিক্
—ডিঙিগুলি ছল্ ছল্,
সারা বন্দর ঘিরে' জাগে এ কি অসীম কৌতূহল!
সৃষ্টিপ্রাতের নতুন জাগার অপরূপ বিস্ময়
জাগিছে আজিকে দিক্ দিগন্তময়,
নিরালার সুর ভেঙেছে আমার অধীর হাওয়ার দোলে
কলরবে আর কলগুঞ্জনে আমার পরাণ ভোলে।

———

১। কড়াল—প্রতিজ্ঞা। ২। নিব্যার ছিল—নিবিয়াছিল। ৩। সাধু—বণিক।

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ক্ষিতীশ মহা আস্ফালন ক'রে খেতে গেল বটে, কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে 'রাণীমা'র অবগুণ্ঠন মোচনের সাহস তার আর কিছুতেই হ'ল না। দু'একবার বাধ'-বাধ' গলায় বললে—কই ? বউদি কোথায় লুকিয়ে বসে রইলেন ? ও ঝি, বউদিকে ডেকে দাও, বলো, ক্ষিতীশবাবু তাঁকে প্রণাম করবেন, একবারটি তিনি তাঁর কোটর থেকে বেরিয়ে আসুন—

কিন্তু ঝি এসে যখন বললে—আপনার বউদি' এক বৎসর হ'ল স্বর্গে গেছেন, এ সংবাদটা যদি না পেয়ে থাকেন তাহ'লে শুনে রাখুন।—ক্ষিতীশ একেবারে দমে গেল! সেই যে চুপটি ক'রে মুখ বুজে সে খেতে বসল' আর একটি কথাও কইতে পারলে না।

ক্ষিতীশ খেয়ে দেয়ে বাড়ী যাবার পর দ্বিজেন একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের বারান্দায় লাইটটা জেলে দিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে একখানা মোটা বই খুলে পড়তে বসল'। বইখানা খোলা ছিল বটে, কিন্তু তাতে তার মন ছিল না। সে ভাবছিল রাণুর কথা! আশ্চর্য্য এই মেয়েটির নিপুণ গৃহকার্য্য! রাণুর এ বাড়ীতে পদার্পণের পর থেকে তার এ গৃহিনীশূন্য গৃহের শ্রী ফিরে গেছে। ঘড়ীর কাঁটার মতো সংসারটি সুনিয়মে সুশৃঙ্খলে চলেছে। তার মাতৃহারা শিশুটি থেকে বাড়ীর চাকর দাসীটি পর্য্যন্ত সবাইকে এই আগন্তুক মেয়েটি যেন কী মন্ত্রবলে একবারে নিজের একান্ত অনুগত করে নিয়েছে। অন্তরাল থেকে একজন মানুষ যে আর একজন মানুষের প্রতি এতখানি লক্ষ্য রাখতে পারে, তার সুখ সুবিধা আরাম ও অভ্যাস সমস্তই এমন করে খুটিয়ে দেখে তার সেবা যত্ন ও তত্ত্বাবধান করতে পারে এ তার ধারণাই ছিল না। প্রতিদিন প্রতি কার্য্যে গৃহের সর্ব্বত্র সে এই দু'খানি অলক্ষ্য হস্তের সেবা যত্নের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হচ্ছিল। তাই আজকের ক্ষিতীশের পরিহাসটা স্মরণ ক'রে সে মনে মনে একটু পুলকিত না হ'য়ে থাকতে পারলে না! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে যেন আপন মনেই ব'ললে,—একেবারে নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে ভূত না হ'য়ে রাণু যদি একটু লেখাপড়া জানা cultured মেয়ে হ'তো, তাহ'লে এ বাড়ীর যে আসনখানি অস্থায়ী ভাবে স্বতঃই তার অধিকারে এসে পড়েছে—সেখানে তাকে আমি হয়ত চির-জীবনের মতো স্থায়ীভাবেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে পারতুম!

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কচি গলায় ডাক শুনে দ্বিজেন চমকে উঠ্‌ল!

—বাবা! তুমি ওষুধ খাওনি কেন? মা তোমাকে বকে' দিতে এসেছে!

দ্বিজেন মুখ ফিরিয়ে দেখে ক্ষানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল... শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে এ যেন কোন র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনা এসে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে!

রাণুর মুখে আজ অবগুণ্ঠন নেই! আজ এই প্রথম সে

এ মেয়েটির মুখখানি অনাবৃত দেখতে পেলে! ইলেকট্রিক লাইটের সমস্ত আলোটা যেন সে মুখের উপর স্থির হ'য়ে পড়েছিল! ঊষার অরুণ আলোয় মকুলিত পদ্মের মতো সে মুখখানি শুভ্র সুন্দর নিষ্কলঙ্ক! ডাগর চোখের দীপ্ত কালো তারা দুটি যেন ভ্রমরের মতো তার উপর খেলা করছে!

দ্বিজেন সসম্ভ্রমে তার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নত করে রইল।

রাণু বললে—সত্যিই আমি আজ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলুম, খোকা মিথ্যে বলেনি। এই মাত্র মশারি ফেলে দিতে গিয়ে—ঘরে ঢুকে দেখে এলুম কবিরাজ মশা'য়ের ওষুধটা যেমন তেমনিই খলে মাড়া প'ড়ে রয়েছে, মোটে স্পর্শ করেন নি—এর কারণ কি? অসুখ অবহেলা করা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

দ্বিজেন অপ্রতিভ হ'য়ে ঈষৎ হেসে বললে—মোটে স্পর্শ করিনি বলাটা ঠিক হ'ল না কিন্তু; ঝুম্মন্ বেয়ারাটার হাত থেকে আমিই ওটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখেছিলুম।

—তারপর ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে ক'নে দেখবার গল্প ক'রতে ক'রতে বেমালুম খেতে ভুলে গেছেন বুঝি?

—না, মিথ্যে কথা বলবো না। আমি ইচ্ছে করেই খাইনি!

—কেন? আমার মত অস্পৃশ্য একজন ওষুধটা খলে মেড়ে দিয়েছিল ব'লে না কি? ... ওষুধে কিন্তু দোষ নেই, আমি শুনেছি!

—আপনার এ অনুমানটা যে কতবড় মিথ্যে তা আমার চেয়ে বোধ হয় আপনার একটুও কম জানা নেই!

—তবে? না-খাওয়ার কারণটা কি শুনি?

—ওষুধ খেয়ে কোনও ফল হবে না।

—সেটা ওষুধ না খেয়েই ঠিক করে ফেলাটা একটু অবিবেচনার কাজ নয় কি?

—তা বোধ হয় বলতে পারেন। কিন্তু ঘুম না হওয়াটা যে আমার কোন শারীরিক গ্লানি নয় এটা আমি খুব ভাল রকমই জানি!

—আমারও যে সে সন্দেহ হয়নি তা নয়, কিন্তু মানসিক গ্লানির কোনও কারণ আপনার খুঁজে পেলুম না বলেই আমি শারীরিক গ্লানিকেই ওটার কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছিলুম! আপনাকে প্রথম এসে যেমন দেখেছিলুম, আপনার শরীর যেন দিন দিন তার চেয়েও খারাপ হ'য়ে পড়ছে! খাওয়া দাওয়া তো একেবারে নেই বললেই হয়। আপনি বড় ভাবিয়ে তুলেছেন। একটা কিছু আশু প্রতিকার না করে আর চুপ করে থাকা যায় না, তাই লজ্জা ঠেলে রেখে আজ আমাকে আপনার সামনে এসেই দাঁড়াতে হ'ল! কী আপনার মনের অসুখ জানালে হয় ত' একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারি!

—জানাবো। কিন্তু তার আগে আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।

—বলুন কি জানতে চান?

—আপনার জীবনের ইতিহাস আমি সমস্ত শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছি।

—সেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বটে; কিন্তু সে তো শুনতে মোটেই প্রীতিকর হবে না!

—তবু, বলতে যদি কোন বাধা না থাকে—

—থাকলেও সে আপনার কাছে নয়, আপনি আশ্রয় দাতা, আপনার সে কাহিনী শোনবার যথেষ্ট অধিকার আছে!

—তা হ'লে আমি শুনতে চাই নে। অধিকারের দাবীতে নয়, অনুগ্রহ করে যদি আমার কৌতূহল পূর্ণ করতে চান, তবেই শুনতে পারি।

—আচ্ছা তাই হবে, একটু অপেক্ষা করুন, খোকা ঘুমিয়ে পড়ল, একে আগে শুইয়ে দিয়ে আসি।

রাণু চলে যেতেই দ্বিজেন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভাবতে বসল'—আজ কেন এ মেয়েটি হঠাৎ তার সামনে বেরিয়ে এল? এতদিনই বা আসেনি কেন? এ কি বিচিত্র এর ব্যবহার!

একটু পরেই রাণু ফিরে এসে দাঁড়াতেই, দ্বিজেন উঠে গিয়ে ঘর থেকে আর একখানা চেয়ার এনে তার ইজিচেয়ারের সামনে পেতে দিয়ে বললে,—এই খানে বসে আপনার গল্প সুরু করুন—

'গল্পই বটে!' ব'লে একটু মৃদু হেসে রাণু চেয়ার খানিতে গিয়ে বসল।

দ্বিজেন বললে—আপনার খাওয়া হয়েছে তো?—

—আজ যে একাদশী, ও কাজটা থেকে আজ আমার ছুটী;

—তবে আজ থাক, কাল শুনবো। সারাদিন নিরম্বু উপবাস করে আছেন, তার উপর আর আপনাকে বকিয়ে কষ্ট দেবো না।

—ও আমার গা' সওয়া হ'য়ে গেছে! আর কোনও কষ্টই হয় না। বরং এই দিনটিতেই আমি একটু বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি পাই! আজকের এই উপবাস সারাদিন আমাকে তাঁর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়! ষোল বছর বয়সে যে দেব তুল্য স্বামীকে হারিয়ে আজ এই দশ বৎসর আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি আজকের দিনটিতে আমি যেন তাঁকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি!

কি জানি কেন এ কথা শুনে দ্বিজেন যেন একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ল, তার মুখখানি যেন হঠাৎ আগুন তাপে ঝল্‌সে যাওয়া কচি পাতার মতো একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল!

রাণু তার জীবন-কাহিনী ব'লতে সুরু করলে।

ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ছিল সে। যখন ম্যাট্রিক পড়ছিল সেই সময় তার বিবাহ হয়, তখন তার বয়স চোদ্দ বৎসর পূর্ণ হয় নি। তাকে যিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন তাঁরই সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। তারা পরস্পরকে ভালবেসে বিবাহ করেছিল। পিতা একজন নিঃসম্বল গায়কের হাতে তাঁর মাতৃহীন একমাত্র আদরিনী কন্যাকে তুলে দিতে প্রথমটা অসম্মত হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে কন্যার একান্ত ইচ্ছা আছে জেনে তারই সুখের জন্য মেয়ের মুখ চেয়ে তিনি সেই দরিদ্র সঙ্গীত-শিক্ষককেই জামাতৃ পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে দান করে চ'লে গেছলেন।

এইখানে দ্বিজেন প্রশ্ন করলে—আপনার স্বামী কি অন্য কোনও কাজ করতেন?

—না, সামান্য কিছু টাকা বাবা আমাকে দিয়ে গেছলেন, কিন্তু স্বামী আমার সেই টাকা নিয়ে কি একটা ব্যবসা করতে নেমে সমস্তই লোকসান্ দিয়ে ফেললেন! তখন বাধ্য হয়ে কলকাতার ঘরবাড়ী সব বেচে আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশের পর্ণ কুটীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। কিন্তু তিনি এ ক্ষতি সহ্য ক'রতে পারলেন না—অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে একলা ফেলে রেখে তিনি হঠাৎ সেই অজ্ঞাত লোকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তখন আমার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। গ্রাম সম্পর্কে আমার এক বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর ছিলেন, তাঁরই সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বৈধব্য জীবনের ন'টা বৎসর—কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রামের দু'একজন প্রেমিক দুশ্চরিত্রের পাগলামী ছাড়া আমার যেন এক রকম নিরুপদ্রবেই কেটে গেছল! তারপর যখন আমার সেই দাদাশ্বশুর, যিনি আমার এক মাত্র অভিভাবক ছিলেন তাঁরও ডাক পড়ল, তখন আর আমি নিজেকে কিন্তু তেমন কিছু নিঃসহায় বলে মনে করিনি। একটা পেট—কোনও চিন্তাই ছিল না বটে, পড়া বোনা খেলাই আর সেতার নিয়ে বেশ দিন কাটাচ্ছিলুম! পঞ্চাশের উর্দ্ধতন বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে কুড়ি বছরের ছেলেটা পর্য্যন্ত গাঁয়ের একাধিক পুরুষ আমার এই ন' বৎসরের বৈধব্য জীবনের মধ্যে আমাকে তাদের অগাধ ভালবাসা ও নিবিড় প্রেম জানাতে কসুর করে নি। তাদের মধ্যে যে কোনও এক জনের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে গেলে তারা যে আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একেবারে রাজরাণীর মতো স্বর্গ সুখে রাখবে—এ সব প্রলোভনও তারা দেখাতে ছাড়েনি! তাদের প্রেমের আতিশয্যে তারা বোধ হয় ভুলেই গেছল যে, আমি কলকাতারই মেয়ে! আর সব চেয়ে মজা হচ্ছে কি জানেন, আমার প্রেমিকদের মধ্যে অনেকেই কলকাতা শহরটা যে কি রকম তা চক্ষেও কখনও দেখেন নি! অথচ আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মহাসুখে রাখবেন বলে তাঁরা সব অকাতরে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন!

ব'লতে ব'লতে রাণী একটু হেসে উঠলো! তার গাল দুটিতে সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট দুটি টোল খেয়ে গিয়ে মুখখানি

এমন সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌ল যে, দ্বিজেন হঠাৎ বলে ফেললে—বাঃ কি চমৎকার!

রাণী সেটা বুঝতে পারলে না, মনে করলে দ্বিজেন ত'রই কথায় সায় দিলে,—তাই বল্‌ল—

—হ্যাঁ, ভারি মজার! কিন্তু মজা ক্রমে জুজু হয়ে উঠল, দাদাশ্বশুর মারা যাবার পরই গ্রামের জমিদার অন্নদা চাটুয্যে একদিন এক প্রেমপত্র লিখে পাঠালেন—

—সে কি! তিনি প্রাচীন হয়েছেন, ত'র উপর নিজে ব্রাহ্মণ, তার উপর সমাজের কর্ত্তা।

—সেই জন্যই ত' গ্রামের অসহায় সুন্দরী মেয়েদের উপর অত্যাচার করাটা, তাঁর পক্ষে খুব সহজ হ'য়ে উঠেছে!

—তারপর?

—চিঠির জব'ব না পেয়ে দূতী পাঠালেন! দূতী যে জবাব আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল, তারপর সেই গ্রামে বাস করা যে আমার পক্ষে কত কঠিন হবে, এ কথা আমার মনে হ'য়েছিল, কিন্তু পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? আর স্থান কই! আছে কে?

—তাই ত! অন্নদা চাটুয্যে এমন?—

—শুধু ওই প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার দীনজন প্রতিপালক বহু জনের অন্নদাতা অন্নদা চাটুয্যে কেন? অতি মহাশয় ও সদাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখুয্যে জেলার প্রধান উকীল, স্বকৃত পুরুষ প্রসন্ন দত্ত পত্তনীদার, সেবক শ্রীরামকালী দাস জাতে কৈবর্ত্ত, ঠিকেদারের কাজ করে কিছু পয়সা হয়েছে বেশী! অতুল পোদ্দার—সোনা রূপোর দোকানে হাতুড়ি পেটায়, সেও আমাকে কুৎসিত প্রস্তাব করে—গয়না দেবার লোভ দেখিয়েছিল! ওই যে বললুম—গাঁয়ের ছোট বড় সব-জাতের সবাই প্রায় আমাকে নষ্ট করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল! এর মধ্যে জাত বিচার ছিল না দেখে প্রেমটা বেজাতক বলেই মনে হয়। শেষে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে কি করি ভাবছি, সেই সময় খবর পেলুম বামুন পিসীরা দল বেঁধে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাচ্ছেন ৺পুরীতে রথ দেখতে। দিন কতকের জন্য রেহাই পাবো ভেবে আমি তাঁদের সঙ্গে যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেললুন। কাল ভোরে যেন বেরুনো হবে। আগের দিন রাত্রে আমি ব্যাকুল মনটাকে শান্ত করবার জন্য সেতারটা টেনে নিয়ে অন্তর বেদনার সুরগুলোকে একটু বাইরে ঝঙ্কৃত করে তোলবার চেষ্টা করছিলুম, রাত্রি যে কত হ'য়ে গেছল, কিছু খেয়াল ছিল না! হঠাৎ দরজা ভাঙার হুড়দাড় শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখি ঘরের ভিতর একেবারে চার পাঁচটা ষণ্ডা মুসলমান ঢুকে পড়েছে! চোখের পলক ফেলতে দিলে না তারা! চীৎকার ক'রে উঠ্‌তে না উঠতেই মুখে কাপড় বেঁধে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে গেল!

দরজা ভাঙার শব্দে এবং আমার এক আধবারের চীৎকারে আশে পাশের দু'চারজন উঠে বেরিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু মুসলমান গুণ্ডাদের লাঠীর আস্ফালন দেখে পলায়ন করলে। এমনি কাপুরুষ সব!

এইখানে রাণী একটু চুপ করলে, একবার চকিতে চোখ দুটো অঁচলে মুছে নিয়ে তারপর বললে,—আমায় তারা কোথায় নিয়ে গেল জানেন?

দ্বিজেন বিস্ময়াভিভূতের মতো উত্তর দিলে—"হ্যাঁ," কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় বলুন ত?

—অন্নদা চাটুর্য্যে জমীদারের বাড়ী!

—এ্যাঁ! বলেন কি? তাহ'লে মুসলমানরা আপনাকে ধরে নিয়ে যায় নি?

—গ্রামশুদ্ধ লোক তাই জানলে বটে, কিন্তু সেই মুসলমান্ গুণ্ডারা যে জমীদারেরই প্রতিপালিত পশুর দল তা কেউ জানলে না। তাই পরের দিন শেষরাত্রে কৌশল করে যখন অন্নদা জমীদারেরর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলুম—গ্রামের কোথাও আমি এতটুকু দাঁড়াবার স্থান পেলুম না! এ নারী মুসলমানের উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে ভেবে সবাই আমাকে দেখে ঘৃণায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে দূর্‌-দূর্‌ ব'লে শেয়াল কুকুরের মতো তাড়াতে লাগ্‌ল!

আমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতুম, কিম্বা জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতুম, কিন্তু, আমাদের গ্রামে মুসলমান কর্ত্তৃক নারী হরণ হয়েছে—তার যোগে এ সংবাদ পেয়েই পরাণ বাবুর দল পরের দিনই, কলিকাতা থেকে গিয়ে

হাজির হ'য়েছিলেন। তাঁরা আমাকে সে দুঃসময়ে আশ্রয় না দিলে যে আজ আমার কী হ'ত কে জানে?

—আমি পরাণবাবুর মুখে আপনার অসমসাহসের কথা কিছু কিছু শুনেছি বটে, আপনি যে আপনার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে সেই দুর্দ্দান্ত জমিদারের কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছিলেন সে বড় কম বাহাদুরী নয়।

—আঃ!—থামুন আপনি! ওই কথা শুনলে রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে! অন্নদা চাটুয্যে আমার দেহটাকে কলঙ্কিত করতে পারেনি অতএব আমার 'সতীত্ব' অক্ষুণ্ণ আছে; এ্যাঁ? আর যদি সে আর পাঁচজন অভাগিনীদের মত আমারও এই শরীরটাকে কলুষিত করতে পারতো তাহলেই আমার মতো অসতী আর হিন্দু-সমাজে খুঁজে পাওয়া যেত না, না? স্ত্রীলোক এত সহজে অসতী হ'য়ে পড়ে না দ্বিজেনবাবু। বাইরেটাকে এত বেশী বড় করে তুলেই আজ আমাদের জাতটাকে আপনারা এমন অন্তরে দীন করে ফেলেছেন! আজ আমার কাছ থেকে একটা অপ্রিয় সত্য কথা শুনুন—বলপ্রয়োগে কোন নারীর উপর অত্যাচার করলেই সে অসতী হ'য়ে যায় না! তারও সতীত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে!

—আমি নিজে সে কথা অস্বীকার করি নি বটে, কিন্তু জানেন তো আমাদের সমাজ—

—তাই তো ক'দিন ধরেই ভাবছি যে আমি ক্রিশ্চান হ'য়ে যাবো! আপনাকে আর এমন বিপদগ্রস্ত করে রাখবো না! আপনি নিশ্চয় আমাকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছেন, তাই কি করবেন স্থির করতে না পেরে রাত্রে আপনার ঘুম হচ্ছে না! কেমন এই ত?—সত্যি ক'রে বলুন, আমার কাছে লুকোবেন না!

—সে কথা খুব সত্য বটে, কিন্তু সমাজের ভয়ে নয়, আমি আমার নিজের ভ'য়েই সশঙ্কিত হয়ে উঠিছি!

—বুঝিচি এইবার! আমি ভেবেছিলুম আপনার দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেই নিরাপদে থাকবো, কিন্তু সেই খানেই দেখ্‌ছি মস্ত ভুল করিছিলুম। না দেখতে পাওয়াতে দেখবার আগ্রহ যেন আপনার উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ছিল, না?

—যথার্থই তাই! আমাদের জাতীয় জীবনে পুরুষদের কোনও অনুষ্ঠানের সঙ্গেই নারীদের প্রকাশ্য যোগ নেই বলে আমাদের কোনও কাজই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারছে না। অসম্পূর্ণ আনন্দের এই অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে সমস্ত জাতটা উপবাসে মরতে বসেছে! পথে দৈবাৎ কোনও নারীকে দেখলে তাই কাঙালের মতো আমরা নির্লজ্জ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি! দৃষ্টির পিপাসা একমাত্র নিয়ত দর্শনেই তৃপ্ত হয়—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তও হয়ে পড়ে! সেই সুযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত অবরোধের বাইরে-আসা মেয়েরা আমাদের কাছে দ্রষ্টব্য রূপেই গণ্য হ'তে বাধ্য!

—হ্যাঁ, যা' বলেছেন, সে গুলো খুবই ঠিক্, কিন্তু, কি জানেন? অবাধ মেশামেশার ফলটা সব সময় সুফলই প্রসব করে না!

—নাই বা করল? তাতে ক্ষতি কি? বাধা যে মনকে পঙ্কিল ক'রে তোলে। দিনের আলোয় শহরের রাজপথ দিয়ে সিঁদ-কাঠি হাতে চোর কি যেতে পারে? সে কেবল নিশীথ রাত্রের স্তব্ধ অন্ধকারে যত সঙ্কীর্ণ গলিপথ খুঁজে বেড়ায় জানেন কি, আপনাকে ভাল করে একবার দেখবার জন্যে আমি চোরের মতো রাত্রের অন্ধকারে পা টিপে কতদিন খোকার বিছানার ধারে ঘুরে এসেছি!

—হলের ঘড়ীতে ঢং ঢং ঢং ঢং ক'রে রাত্রি চারটে বেজে গেল! রাণী চমকে উঠে বললে—'ওমা! এত রাত পর্য্যন্ত আপনাকে বকাচ্ছি, কাল সকালে উঠেই ত আবার কাছারি যেতে হবে! চলুন, চলুন, উঠে পড়ুন, আপনাকে শুইয়ে তবে আমি একটু গড়াতে যাবো—

দ্বিজেন শান্ত ছেলেটির মতো উঠে পড়ল। শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে রাণী মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আজ আর আমাকে ভাল ক'রে দেখবার জন্যে আর উঠবেন না ত?

দ্বিজেন অপরাধীর মত বল্লে, আমাকে মাপ কর।

—ক্রমশ

অভিসার

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

হে বিরহী,—হে প্রণয়ী দেবতা আমার,
কল্পাতীত কত কাল হ'তে নাহি জানি তব অভিসার
আমারি লাগিয়া,—
কত দিন কত রাত্রি বিনিদ্র জাগিয়া
ক্লান্তিহীন পদে
কত পথে।
শূন্য হ'তে সম্ভবের অর্গল হরিয়া
বিকাশের দ্বার খুলে' সেই কবে কোন্ ছলে এলে বাহিরিয়া
ব্যাকুল আবেগে;—
তারপর দ্রুত বেগে
বাষ্পে-জলে-মেঘে,
নানা ধাতু, জড়ে,
নানা স্তরে,
আলো আঁধারের ছন্দে
বিচিত্র ঋতুর স্পন্দে
তৃণ-তরু-পল্লবের দলে
বিকশিয়া ফুলে-ফলে,
নানা পথে নেমে' উঠে;
ছুটে' ছুটে',
বিশ্ব-প্রাণ-সাগরের তীরে
চলে'-ফিরে'
ভ্রমি' ভ্রমি',
পশুত্বের পথ অতিক্রমি'
এলে তুমি মনোময় মানব-জীবনে—
তার সেই যাযাবর জীবন-যাপনে,
জীবনের দ্বন্দ্বে,
উদ্দাম আনন্দে;

তারপর তার গোষ্ঠী, তার পরিবার,
সমাজে সংস্কারে,
তার আবিষ্কারে,
তার সভ্যতায়,
তার প্রেমে, তার বেদনায়,
তার সুখে
কালে-কালে যুগে-যুগে
তার জন্মে, মরণে তাহার,
মৃত্যু হ'তে জীয়ে ওঠা জীবনে আবার,
বারম্বার
এইরূপে আমারই লাগি'
নিত্য তব অভিসার হে দেবতা বিরহী বিবাগী!
এই আমি—আমি জানি আমারো এ হিয়া
ফিরিছে উদাসী হ'য়ে তোমারে খুঁজিয়া।
বিস্মৃত সে শৈশবের মাতৃক্রোড় হ'তে
সেই কবে যাত্রা এর অভিসার-স্রোতে;—
কৈশোরের ক্রীড়া-সাথী সাথে
লঘু পদ-পাতে
তোমারই অভিসারে
বারেবারে
চলেছে ছুটিয়া
এই হিয়া ...
যৌবনের প্রথম উন্মেষে
তোমারেই চেয়ে এ যে চলেছিল বাউলের বেশে,
বাসনার একতারা নিয়া
ঝঙ্কারিয়া ঝঙ্কারিয়া,
কামনার রক্ত-রাগ ফুল-বন দিয়া;—

তরুণী প্রিয়ার কালো চুলের তিমিরে,
উদ্বেলিত বক্ষ-সিন্ধুতীরে,
দৃষ্টির সে তড়িত-ঝলকে,
কপোলের উজ্জল প্রভাতে, ওষ্ঠের সে গোধূলি-আলোকে,
চলিয়াছে তোমারি লাগিয়া
এই হিয়া ...
তারপর প্রৌঢ়ত্বের বাটে—
তেপান্তর মাঠে,
কুঞ্চিত ললাটে,
চিন্তার ঊষরে
সম পদ-ভরে
এসেছে চলিয়া
এই হিয়া ...
আর দূরে নেই,—
সম্মুখেই
পলিত ধূসর ঐ বার্দ্ধক্যের ভূমি ;
চলিয়াছি, চলিতেছি আমি—কোথা তুমি ?
হে বিরহী, তোমার আমার দুজনার
এই অভিসার
এ কি চিরন্তন ? অফুরাণ ?
নেই এর অবসান ?
আজি ভাবি তাই,—
কোন্ ঠাঁই,
কত দেরী আর,
কবে হবে মুখোমুখি মিলন দোঁহার ?
হে বিরহী প্রণয়ী আমার !
তুমি কোথা—আমি কোথা আর—
চমৎকার
এই অভিসার !

সমালোচনার কথা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সম্যক দৃষ্টি না থাকিলে সম্যক আলোচনা হইবে কি করিয়া ? অথচ এই সম্যক্ দৃষ্টি বস্তুটি জগতে কতই না দুর্লভ ! যে জগতের মধ্যে মানুষ বাস করে সে জগৎ অসীম বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ; সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে বিজ্ঞানে সমাজে ধর্ম্মে রাষ্ট্রে মানুষ—এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার অনুভব ও জ্ঞানকে পরিস্ফুট করিবার ক্রমাগত প্রয়াস পাইতেছে। এই অসীম রহস্য পরিপূর্ণ জগতের যতটুকু তাহার নিকট ধরা দিতেছে, ততটুকুর অনুভব এবং জ্ঞান লইয়া সে তাহার অন্তর্জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। আর সেই অন্তর্জীবনের রূপখানি তাহার ধর্ম্মে ও সমাজে, সাহিত্যে ও শিল্পে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

এই জন্যই সাহিত্যকে কোনো সমালোচক জীবনের সমালোচনা বলিয়া অভিমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই যে বিচিত্র রহস্যময় জীবন আপনাকে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রকাশ করিতেছে, প্রত্যেক মানুষ তাহার কতটুকুই বা অনুভব করিতে পারে ? কতটুকুই বা দেখিতে পারে ? তবু যতটুকু সে দেখে ততটুকু লইয়া সে একটা সমগ্রতার ধারণা করিতে প্রয়াস পায়। সাহিত্যসৃষ্টি তাহার এই জীবনকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস। সাহিত্যের মধ্যে তাই পাই সাহিত্যিকের জীবন সম্বন্ধে অনুভব এবং জ্ঞানের প্রকাশ। সাহিত্যিকের দৃষ্টিশক্তির তীব্রতা ও গভীরতা তাঁহার জীবন-অনুভবকে, তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়মিত করে। এই জন্যই সাহিত্যকে জীবনের সম্যক আলোচনা না বলিতে

পারিলেও, জীবনের আলোচনা নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায়।

সৎ-সাহিত্য অথবা সত্য-সাহিত্য সৃষ্টির মূলে তাই সত্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে। কোন্ সাহিত্যিকের সত্য-দৃষ্টি আছে এবং কাহার নাই ইহা লইয়া তর্ক যতই থাকুক, সত্য-দৃষ্টি এবং মিথ্যা-দৃষ্টি বলিয়া যে দুইটি স্বতন্ত্র রকমের দেখা আছে তাহা লইয়া কাহারো কোনো তর্ক থাকিতে পারে না। সুতরাং দৃষ্টিবিকারের ফলে বিকৃত সাহিত্যরচনা যে হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন একটি আলোচনা-জীবন ও জগতের উপর একটি মন্তব্য। যুগে যুগে, দেশে দেশে ব্যক্তির পর ব্যক্তি মন্তব্যের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে; দৃষ্টিভেদের অনন্ত বৈচিত্র্য ও তারতম্য মানুষ তাহার জীবনে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে ফুটাইয়া চলিয়াছে।

এই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ যে-জীবনের, তাহা যদি কোনো মৌলিক সত্যের, কোনো শাশ্বত সত্যেরই প্রকাশ হয় তাহা হইলে এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোথাও-না-কোথাও একটি সমন্বয়ের—সামঞ্জস্যের—সুসঙ্গত অর্থের সম্ভাবনা কল্পনা না করিয়া পারা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন লইয়া আলোচনা করিলেও তাহার মধ্যে সমন্বয়চেষ্টা পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানব তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে একটি মাত্র অর্থের পরিপূর্ণতা দিয়া ভরিয়া তুলিতে চায়, নানা বর্ণে ও রূপে সে তাহার জীবন-শতদলকে বিকশিত করিয়া তুলিতে চায় সত্য, কিন্তু তাহার মর্ম্মকোষে সে একটি মাত্র বিশেষ মাধুর্য্যকে বিশেষ রসকে সঞ্চিত করিয়া তুলিতে থাকে।

জীবনমাত্রই এই সমন্বয় সাধনের, সুরসঙ্গতির একটি বিশেষ প্রয়াস—সত্যদৃষ্টিকে পাওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা বলিয়া মনে হয়। যে পরিপূর্ণ সত্য পরমঐক্যে বিধৃত হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যে আপনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে সেই সত্যের সহিত প্রত্যেক জীবন আপনার সুর মিলাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু কি দেখিতে পাই? সুর মিলে না, ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বের আলোক বাতাসের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না; তাই জীবনে কত বিশৃঙ্খলা, কত বেসুর, কত দ্বন্দ্ব!

কিন্তু জীবনের সবখানি ক্ষেত্রই যদি কেবল অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় হইত তাহা হইলে যে সত্যের মৃত্যু হইত, সত্যের প্রকাশ-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত! এই ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে কখনো কখনো কোথাও কোথাও সত্যের চকিত চমক দেখা যায়, মুহূর্ত্তের জন্য অকস্মাৎ দিব্যদর্শন হইয়া যায়, অনন্ত জীবনের আলোকে খণ্ডিত জীবনখানি আলোকিত হইয়া উঠে। যে-সব সাহিত্যিক ও শিল্পী, কবি ও সাধকের মধ্যে এই দিব্যদর্শন ঘটে, তাঁহারাই জীবনের সত্য আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে মানবসমাজ চিরকাল ঋষি বলিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁহারা জীবনের আলোচনাই শুধু করেন নাই, তাঁহারা জীবনের সমালোচনাও করিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কিন্তু সমালোচক নামে একদল লোক চলাফেরা করেন, তাঁহাদের উপর আজকাল অনেকেরই রোষদৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিতে পাই। সমালোচক না বলিয়া যদি ইঁহাদিগকে শুধু আলোচক বলিয়াও মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও অনেকেই ইঁহাদিগকে সাহিত্যের আসরে স্থান দিতে নারাজ। হয় ত কোথাও কোথাও কোনো কোনো আলোচক তাঁহাদের অহমিকা এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আলোচনার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তা বলিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে আলোচনার কোনোই স্থান নাই, শুধু স্থান রহিল যে-কোনো রকমের সাহিত্য-স্রষ্টার, এ কথা মানিয়া লই কেমন করিয়া তাহাও ভাবিয়া পাই না।

পূর্ব্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সাহিত্যস্রষ্টাও একজন আলোচক; তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টি এবং মনোভাবটিকে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যটিকে প্রচার করেন। এইজন্য আলোচক হিসাবে স্রষ্টা এবং তথাকথিত সমালোচক বিশেষে কোনো প্রভেদ নাই। স্রষ্টা তাঁহার কল্পনার মায়া দিয়া তাঁহার

মন্তব্যটিকে রূপে ও রেখায়, গল্পে ও গানে প্রকাশ করিয়া অন্যের চিত্তকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করেন, সমালোচক এই কল্পসৃষ্টির জগতের সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি-লব্ধ জগতের তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া থাকেন, সমালোচক কিছু সৃষ্টি করেন না, বিশেষ বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টিকে সত্যের কষ্টি-পাথরে বিচার করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণের প্রয়াস পান মাত্র। সুতরাং স্রষ্টাকে যদি সৃষ্টির অধিকার দিতে আমাদের কোনো আপত্তি না থাকে, সাহিত্য-সমালোচককেও আলোচনার সম্পূর্ণ অধিকার দিতে আমাদের অরুচি ঘটিবার কোনো কারণ নাই।

বরং ভাবিয়া দেখিতে গেলে সমালোচকের একটি বিশেষ স্থান এবং প্রয়োজন আছে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

জীবন ও জগতের সত্য সম্বন্ধে কোনো কোনো মানুষের মধ্যে একটি সহজ অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ যে না ঘটে তাহা নয়। ইঁহারা যেন ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা সত্যকে লাভ করেন। যদি কোনো সাহিত্যস্রষ্টা এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি যে সত্য সৃষ্টি হয়, তিনি যে সত্য সমালোচনা করিতে পারেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সত্যানুসন্ধানের আরেকটি পন্থা আছে, সেটি অভিজ্ঞতার (Experience) পন্থা। সাধারণ সাহিত্য-সমালোচক কোনো ধ্যান-দৃষ্টির অধিকার অর্জ্জন না করিয়াও বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা একটি সত্যকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান যেমন ধ্যানদৃষ্টির অপেক্ষা না করিয়াই কেবল বহু বিচিত্র তথ্য-সংগ্রহের পর তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশ্বসত্যকে আবিষ্কার করেন, সমালোচকও তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা-মূলক পন্থা ধরিয়া সাহিত্য-সমালোচনার কষ্টিপাথর আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন।

কোনো বিশেষ সাহিত্যিকের সৃষ্টি তাঁহার বিশেষ মনোভাবের মধ্যেই আবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টির দিকে চাহিয়া, তাঁহার বিশেষ মনোভাবের পরিচয় পাইলেও, সেই সৃষ্টি বিশ্ব-জনীন সত্যের অথবা বহু সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে সমন্বয় রহিয়াছে তাহার সহিত কতটা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। এখানে সমালোচক যে কাজের ভার লইয়া অগ্রসর হন তাহা অত্যন্ত গুরুতর এবং কোনো বিশেষ সাহিত্যিকের আলোচনা হইতে তাঁহার সমালোচনার মূল্য বেশি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবনের মূলে একটি নিগূঢ় ঐক্য রহিয়াছে। সেই ঐক্যের দিক দিয়া জীবনকে না দেখিতে পারিলে তাহাকে সত্য করিয়া দেখা হয় না, জীবন শুধু সামঞ্জস্যহীন বিচ্ছিন্নতায় পর্য্যবসিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সেই সত্যটিকে আবিষ্কার করিতে না পারিলে, একই ব্যক্তির বিভিন্ন কালের সৃষ্টির মধ্যে পর্য্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। স্রষ্টার সৃষ্টির পক্ষে আপনার এই অখণ্ড আত্মপরিচয় নিতান্ত প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু যদি আত্মপরিচয়ের দায় থাকে তাহা হইলে তাঁহাকেও সমালোচকের শরণ লইতে হইবে অথবা সমালোচকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমা-লোচক কোনো সাহিত্যিকের বিভিন্ন সৃষ্টির আলোচনা করিয়া যেমন তাঁহার একটি অখণ্ড পরিচয় (যাহা তাঁহার নিকটও হয় তো গোপন এবং অজ্ঞাত) আবিষ্কার করিতে পারেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে-পরিচয় প্রকাশ পাইতে থাকে তাহাও আবিষ্কার করিতে পারেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে বাঙালী-জাতির একটি প্রকৃতি ও সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা এক সময় বাঙালীর জ্ঞান এবং বুদ্ধির নিকট নিতান্তই অগোচর ছিল। সমা-লোচক আসিয়া যে দিন বাঙ্‌লা সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেন সে দিন হইতে বাঙালীর আত্মস্বরূপের অন্তত কতকটা পরিচয় সে পাইতে পারিয়াছে। তাই সুদূর বৈষ্ণবযুগের অন্ত-র্নিহিত প্রাণের সহিত এই বিংশশতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যের মর্ম্মগত স্বরূপের যোগ কোথায় তাহা বাঙালী বুঝিতে পারিতেছে। জাতীয় উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে এই জাতিগত পরিচয়ের মূল্য কতখানি তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সমালোচকের প্রয়োজনকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন না।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্রমবিকাশের পথে এই সমালোচনার মূল্য কতখানি তাহা আমরা সব সময় ভাবিয়া দেখি না। কিন্তু অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার সমালোচনা দ্বারা মানুষ যে

অতীতের সোপান অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের পথে উঠিয়া যায় তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। শৈশব হইতে মানুষ তাহার জ্ঞান বুদ্ধিকে তাহার কর্ম্ম এবং কল্পনাকে কেবলি মার্জ্জিত করিয়া চলিয়াছে এই অতীতের সমালোচনা দিয়াই। সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ যে বহুল পরিমাণে এই আলোচনার সহায়তায় হইয়া থাকে তাহারও প্রমাণ সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন। বহুল আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে বিস্তর আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িতেছে ভয়ে যাঁহারা ইহার নির্ব্বাসন কামনা করেন তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান মনে করিতে পারা যায় না। কারণ একমাত্র আলোচনার দ্বারাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, তাহার বিচারশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতে থাকে এবং এইরূপ আলোচনার ফলে শ্রোতা এবং পাঠকের মন যখন অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া উঠে তখনই সেখানে গভীরতর সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদ আসে। স্রষ্টা যেমন তাঁহার সৃষ্টির দ্বারা, তাঁহার অনুভব ও বিচারের দ্বারা পাঠকের মনকে উচ্চগ্রামে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন তেমনি উন্নত শ্রেণীর পাঠক এবং শ্রোতার অস্তিত্বই গভীরতর ও বিশালতর সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জাগাইয়া বড় সাহিত্যিক এবং শিল্পীর জন্মকে সম্ভব করিয়া তোলে।

নব্য বাঙলা সাহিত্যের উগ্র সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোনো চিন্তাশীল লেখক সমালোচক শ্রেণীকে নরকস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাগণের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। তাহা না করিয়া যদি ইঁহারা সত্যকার সমালোচনার কাজে হাত দিয়া নব্য-সাহিত্যের একটা যথাযথ মূল্য নিরূপণের সংযত চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আলোচনার মূল্য বেশি হইবে বলিয়া মনে হয়।

দেবতা কোথায় ?

শ্রীমতী চামেলীপ্রভা দেবী

একদা পাগল ঘুরিতে লাগিল
খুঁজি দেবতার ঠাঁই ;
তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া দেখিল
দেবতা কোথাও নাই।
মন্দিরে গিয়ে দেখে সেথা শুধু
পাষাণ-মূর্ত্তি গড়া ;
না জানি দেবতা কতদিন আগে
ছাড়িয়া গিয়াছে ধরা।
তন্ময় হ'য়ে ভাবিতেছে ক্ষ্যাপা,
'কোথা গেলে দেখা পাই ;
এত খুঁজিলাম দেবতারে আমি,
তবে কি দেবতা নাই ?
মন্দিরে যাই, দেখি সেথা শুধু
গগন-স্পর্শী চূড়া ;
দেবতা কোথায় ? দেবতার স্থানে
পাষাণ মূর্ত্তি পূরা।'
হেনকালে এক জটাজুট ধারী—
বলে তারে এসে, 'শুন,
বাহির ছাড়িয়া ভালো করে আগে
আপনারে দেখ পুন।
আপন হৃদয় যখন দেখিবে
গগন ছুঁয়েছে, ভাই,
তখনি দেখিবে জুড়িয়া রয়েছে
দেবতা সকল ঠাঁই।'

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১১

শীতের প্রভাত। বৃহৎ নগরী—শৃঙ্খলায় উৎশৃঙ্খলতার উৎসব। বাড়ী,—বাড়ী আর বাড়ী—সমস্ত আকাশটা তাহারই উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—ছিন্ন, পুরাতন, ময়লা। পথগুলি প্রশস্ত, কিন্তু চলিতে গেলে পথ পাওয়া যায় না। গাড়ী, যান্-বাহন, মুটে মজুর ভিখারী; উপার্জ্জন প্রত্যাশী মানুষ, আহার সন্ধানী কুকুর, সবাই এক পথে চলিয়াছে! যে যাহাকে পারে পাশ কাটাইয়া চলে, কাহারও দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। উন্মাদ এই শহরের সব কিছু; মানুষ, যন্ত্র, পশু।

কর্ত্তার আমলের একটি পুরাতন বন্ধু আগেই একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিনের এতবড় একটা সংসার দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর মাথায় করিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল।

নয়নতারা বউ-ঝি লইয়া নামিয়া বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইলেন। যেন পরের বাড়ীতে আসিয়াছেন কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। আশে পাশের বাড়ীর জানালা হইতে মেয়েরা উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল। পাড়ার দুই চারিটি ছেলেমেয়ে আসিয়া গাড়ীর পাশে দাঁড়াইল। পাড়ার কাহার বাড়ীর একটা বুড়া ঝি ইহারই মধ্যে বাবুদের পাশ কাটাইয়া নয়নতারার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ সকলকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া হঠাৎ ঘোমটার কোণ্‌টা দাঁতে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মেয়ের বে' দিতে এলে বুঝি মা-ঠাকরোণ? তা বেশ।

নয়নতারা নিরুত্তর রহিলেন। ঝি আবার বলিল, তা' আজকাল যে দিন পড়েছে, বে' দোয়া কি চাড্ডিখানি কথা! ঘর-বর পেতে পেতে মেয়ের বয়েস হয়ে যায়।—একটু থামিয়া আবার বলিল, তা' এমন কি আর বয়েস হয়েছে—দেখ্‌তে যা' একটু বড় দেখায়, কি বল মা?

নয়নতারা প্রমাদ গণিলেন। তাহাকে কি বলিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না দেখিয়া পুত্রবধূ বিমলা উত্তর দিলেন, না গো বাছা, এর বিয়ে হয়ে গেছে। এ বাড়ীতে আমরা থাক্‌তে এসেছি।

ঝি-টা যেন সাপের গায়ের উপর পা দিয়া ফেলিয়াছে এমনি একটা ভাব করিল।

নয়নতারা বলিলেন, তোমরা ওপরে যাও বউমা, যা' পার গুছিয়ে নাও গে। জিনিষ পত্র সব নাবলেই আমিও যাচ্ছি।

তাহারা চলিয়া গেলে ঝি-টা একটু একটু করিয়া নয়নতারার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। যেন বড় লজ্জা, এমনি একটা ভাব করিয়া নয়নতারার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, হ্যাঁ মা, তোমরা বুঝি ক্রেস্তান্?

নয়নতারা অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ কানের কাছে কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। কি করিবেন, ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এখন যাও বাছা; আমরা একটু গুছিয়ে গাছিয়ে বসি, তারপর একদিন এসে গল্প করো।

বুড়া ঝি চলিতে চলিতে খুব নীচু গলায় বলিল, গেরস্তের এয়োতি, কপালে সিঁদূর নেই কি না তাই বল্‌ছিলাম।

ঝি-টা চলিয়া গেল, নয়নতারা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু মনে মনে জানিলেন, এরই মধ্যে পাড়া-ময় নিশ্চয় তাঁহাদের সম্বন্ধে অদ্ভুত কিছু একটা কথা গেজেট্ হইয়া গিয়াছে।

গাড়ীর ভাড়াপত্র চুকাইয়া দিয়া সকলে উপরে আসি-লেন। মাত্র পাঁচখানি ছোট ছোট ঘর—আর একটি উনান্ ও একটি মানুষের অর্দ্ধেক দেহ ধরিতে পারে এমনি একখানি কুঠুরি, তাহার নাম রান্নাঘর। দীপক স্থির হইয়া বসিতে পারিল না, সে তর্ তর্ করিয়া নীচে নামিয়া ঘুরিয়া লইল। রান্নাঘরটা উঁকি দিয়া দেখিতে গিয়া মাথায় চোট্ লাগিল।

শোভনা ও বিমলা ভাঁড়ার গুছাইতে ছিল। দীপককে কলতলায় মাথা পাতিতে দেখিয়া তাহারা দু'জনেই ছুটিয়া আসিল। মাথাটা একটু কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। রজত ও নয়নতারা উপরে ছিলেন, নীচে একটু উঁচু কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারাও নামিয়া আসিলেন। দীপক মাথা তুলিয়া হাসিয়া বলিল, ভালই হোল, একজনের মাথা কেটে আর সবাইর মাথা বেঁচে গেল। খুব সাবধান সব তোমরা। অন্তত রান্না ঘরটিতে ঢুকতে সবিনয়ে মাথা নত করে' চল্‌বে।

সকলের মনে একটু যা বিষণ্ণতা আসিয়াছিল, দীপকের কথায় তাহা কাটিয়া গেল, সকলে হাসিয়া উঠিল।

সংসার এক রকম চলিয়াছে মন্দ নয়। দীপক একটা চাকরি পাইয়াছে। যাহা পায় তাহা সব আনিয়া মায়ের হাতে দেয়। রজত এম-এ পড়িতেছে। সন্ধ্যার সময় একটা টিউশনি করে তাতে গোটা ত্রিশ পায়। আয় এই, ব্যয়ের কথা মা জানেন। আর কেহ তাহার খবরও জানিতে পারে না। দু'বেলা খাবার সময় ভাত তরকারী সবই জুটিতেছে, কিন্তু কেমন করিয়া একটা মাস এত অল্প আয়ে এমন ভাবে চলিয়া যায় তাহা নয়নতারাই জানেন। প্রায় রোজই অল্প স্বল্প মাছও আসে, মাঝে মাঝে ছেলেদের জন্য মাংসও হয়, দীপক ভাবিয়া পায় না এ সব কি করিয়া হয়। একদিন সে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, হ্যাঁ মা, তুমি এত অল্প টাকায় এ সব কর কোত্থেকে?

মা হাসিয়া বলিলেন, কেন, তোদেরই রোজগারের টাকা থেকে!

দীপকের মুখখানা হঠাৎ খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে বলিল, হয় মা, তাতেই হয়?

নয়নতারা সস্নেহে বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, তোদের টাকাতেই সব হয়ে যায়;—আমি ত সবই দেখ্‌লাম। অনেক টাকা ত এক কালে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, তখন তবু টানাটানি হোত। কিন্তু এখন ত বেশ চল্‌ছে!

দীপক কি ভাবিয়া বলিল, কিন্তু এত অল্প টাকায় চালাতে তোমার ত কষ্ট হচ্ছে।

নয়নতারা দীপকের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, তা' আমার একটু হচ্ছে, কিন্তু তোদের হচ্ছে তার চাইতে বেশী। তোরা চিরকাল বড়চালে চলে' এসেছিস্।

শোভনা এতক্ষণ কোনও কথা বলে নাই। রাত্রের কতগুলি ভিজা ভাত ছাঁকিয়া সকাল বেলার ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু তুমিও ত মা বড়চালে চলে এসেছ। তোমার ত এই টানাটানিতে আরও বেশী কষ্ট হবার কথা। কি ছিলে আর কি হয়েছ!

নয়নতারা খানিকটা হাসিলেন। বলিলেন, কি ছিলাম আমি? আমার বিধবা মায়ের সাতটি মেয়ে। একটিরও তখন বিয়ে হয় নি। সম্বল এক চিল্‌তা বসত্ বাড়ী, আর এক সিন্ধুক পিতল কাঁশা আর তামার সেকেলে বাসন। তবু আমরা দুবেলা পেট ভরেই খেতাম। পরনে কাপড় ছিল। অবিশ্যি সাজ গোজ করতে পেতাম না! তাও বা মন্দ কি! তবে বলি শোন। আমার একটি মাত্র দাদা ছিলেন, তিনি সবাইকার বড়। কন্দর্পের মত চেহারা। হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান ছেলে। চোখে কি অসুখ হোল একবার,। ডাক্তারের ওষুধ চোখে দিতেই একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন।

তিনি অন্ধ হয়েও একটা ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেন। বেতন বাইশ টাকা, আর পূজা পার্ব্বনে এক আধখানা কাপড়। বল্‌লে তোরা বিশ্বাস করবি নে, ঐ টাকা থেকে আমাদের খাওয়া পরা, তার ওপর মা আবার তাই থেকে কিছু কিছু জমাতেন। সাতটি মেয়ের বিয়ে দিলেন, একটি পয়সা ধার করেন নি। অবিশ্যি তখনকার দিনে তাঁর কোনও জামাই-ই টাকা পয়সা কিছু নেয় নি।

নয়নতারা লাউশাকগুলি কুটিয়া ধুইয়া তুলিলেন।

শোভনা উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মা, তোমার ত খুব গরীবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বাবা ত শুনেছি তখন মোটে পঁচিশ টাকা মাইনে পেতেন। তোমায় ত তেমন কিছু দিতে পারতেন না, তোমার কিছু খারাপ লাগ্‌ত না?

নয়নতারা যেন ছোট বালিকার মত বলিতে লাগিলেন, তোর বাবা আমাকে যা' দিতেন, তার কাছে আর কিছু চোখে ঠেকত না। এক দিনের তরে মুখে কোনও দিন বলেন নি আমাকে কতখানি ভালবাসেন, কিন্তু চোখে মুখে কথা বার্ত্তায় আমার জন্য যে মমতা উছলে উঠ্‌ত তা দেখে—পেয়েই আমার মন ভরা থাক্‌ত।—আর দিতেন বই কি! বিয়ের বছর পাঁচেক পরে একখানা গোলবদন শাড়ি কিনে এনে দিলেন। সে দিন তাঁর কি আনন্দ! গোল বদন শাড়ির তখন খুব নাম ডাক্—বড়লোকের বউরা পরে। আমি মাথায় করে নিলাম। কোথাও যেতে আসতে ঐ শাড়িখানা পরে যেতাম, আবার যত্ন করে পাট ক'রে তুলে রাখতাম। বিমলা জানে, সেই শাড়িখানা তার বিয়েতে আমি তাকে দিয়েছিলাম। তখনও একটা সুতো সরে নি।

শোভনা বলিল, তবে আমরা পারি না কেন মা?

নয়নতারা বলিলেন, পার না তা' কিছুটা তোমাদের দোষ, কিছুটা অন্য লোকের।

বঁটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া বলিলেন, সবই পারলেই পারা যায়। মানুষ যা পারে না ভাবে, তা একে একে সবই পারে। তোমরা আমার সোনার ছেলে মেয়ে, তোমরা যদি লক্ষ্মীর মত না থাকৃতে, আমি কি এমন করে চালাতে পারতাম? পারতাম না। বাড়ীতে একটা অশান্তি লেগেই থাকৃত।

রজতের কলেজের বেলা হইয়া গিয়াছিল, সে খাইতে আসিল। দীপক উঠিয়া স্নান করিতে গেল, আর মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে ভাবিতে লাগিল, আমার মায়ের মতই কি সব মা?

বছর দুই এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। রজত ও দীপক বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারিল না।

শোভনা লক্ষ্য করিয়াছে তাহার দুই ভাইয়ের দুই ভিন্ন প্রকৃতি। রজতের বন্ধু বান্ধব কম, কিন্তু যাহাদের সঙ্গে সে মেশে তাহাতে তাহার দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া যায়। সে মাঝে মাঝে নিজের পয়সা দিয়া এটা ওটা নিজ পরিবারের জন্য কিনিয়া আনে। সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাহার এ সঞ্চয়ে চেষ্টা দেখিতে খুব ভালই লাগে।

কিন্তু দীপক স্নেহপ্রবণ, বান্ধববৎসল হইলেও, সে যেন এক এক সময়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, একাকী। কোনও দিন বা লইয়া আসে অভুক্ত কাহাকেও, কোনও দিন বা ধরিয়া বসে দশটা টাকা এখুনি না দিলেই নয়, একজন কাহারও ভয়ানক বিপদ বা এম্‌নি কিছু, তাহাকে না দিলেই নয়!

মা হয় ত কোনও কোনও বার ফিরাইয়া দিয়াছেন। কোনও বার বা হাতে থাকিলে দিয়াছেন। কিন্তু কোনও কালে সেরূপ দেওয়া-টাকা ফিরাইয়া পান্ নাই। দীপককে সে কথা বলিলে সে বলে, তারা ত নেবার সময় বলে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু না দিলে আমি কি করব!

প্রথম প্রথম শোভনা তর্ক করিয়াছে।—যাদের ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই তাদের কিছু চেয়ে নেবারও অধিকার নেই। লোকের অন্তত এটুকু দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। তুমি যা করছ, এতে করে' দায়িত্বহীনকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এরূপ তর্ক মাঝে মাঝে দীপকের সঙ্গে হইত।

দীপক অনেক চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু বুঝাইয়া উঠিতে পারিত না।

একদিন এমনি এক তর্কে মা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন, সব লোকই যে কিছু ফেরত দেবেনা মনে করেই নেয় তা নয়, অনেক সময় অভাবে অবস্থায় পড়ে তারা শত ইচ্ছা সত্বেও দিয়ে উঠতে পারে না। না দিতে পেরে তাদের মনে যে যন্ত্রণা তা বড় সামান্য নয়। খুব বেশী অভাব না হলে সাধারণ গেরস্ত বড় একটা কারুর কাছে হাত পাত্‌তে চায় না। হাত পাত্‌তে তাদের মাথা কাটা যায়, কিন্তু কি করবে! অবিশ্যি টাকা নিয়ে না-দেওয়া যাদের ব্যবসা তাদের কথা আলাদা।

দীপক যেন কূল পাইয়া বলে, হ্যাঁ মা, তাই ত!

তারপর শোভনা আর কোনও কথাই বলে নাই। দীপককে বুঝিতেই চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যতটা না বুঝিতে পারিয়াছে তার বেশী দীপকের প্রতি তার মমতাই বাড়িয়া গিয়াছে।

তখন জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধিয়াছে। অন্য ইউরোপীয় জাতিও জার্ম্মানীকে অপদস্ত করিতে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে তখন অর্থাগমের দারুণ অভাব। আপিসে আপিসে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কাজ কর্ম্ম অচল, সকলেই কেরানী কর্ম্মচারী যথাসম্ভব কমাইয়া দিতেছে। তাহাতে দরিদ্র কর্ম্মচারীদের যাহাই হউক, আপিসগুলি বাঁচিয়া যাইতেছে। যখন লোকের মনে এমনি একটা ভয় কখন কার চাকরি যায়, এমনি দিনে দীপক নিজে ইচ্ছা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিল।

বন্ধু বান্ধব ত যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল, বাড়ীর লোকেরাও তাহার এই ব্যবহারে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইল।

একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দীপক গৃহে ফিরিয়াছে, শোভনা ধীরে ধীরে গিয়া তাহার কাছটিতে বসিল।

দীপক চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ গভীর অতলে নামিয়া কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এমনি।

শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দীপক?

দীপক মাথা তুলিল। বলিল না কিছু না। বলিয়াই খানিকটা চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু আর যেন নীরব থাকা সম্ভব হইল না। সে ভারী গলায় ডাকিল, দিদি!

শোভনা বলিল, কি বলতে চাও আমার কাছে বল। আমি আগে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝ্‌তে পারছি তোমার মনের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের মনের আশা ইচ্ছার অনেকখানি প্রভেদ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তোমার চাকরি ছাড়ার কথা শুনেও মা একটি কথা বললেন না। অথচ নিজের চোখে দেখছি ত কি কষ্টে, কত হিসেব করে ঐ টাকা কয়টি দিয়ে আমাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।—কি করবে ভেবেছ?

দীপক শুধু বলিল, হুঁ। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, আচ্ছা দিদি, তুমি বলতে পার, তুমি কি করবে!

দেখিতে দেখিতে শোভনার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়িল। অনেক কষ্টে ঠোঁট চাপিয়া উদ্বেলিত আবেগ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময় নয়নতারা চিন্তাকুল ভাবে আসিয়া ছেলে মেয়ের কাছে চুপটি করিয়া বসিলেন।

ঘরের আলোটা তখনও জ্বালা হয় নাই। দীপক নিষেধ করিয়াছিল, আজ আলো তাহার ভাল লাগে না। সেই বিষণ্ণ অন্ধকারে তিন জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নয়নতারা আস্তে আস্তে বলিলেন, মালীর চিঠি এসেছে, সন্তান প্রসবের পর কয়েক দিন ভুগে চন্দনা মারা গেছে। মালী একবার তোমাকে দেখতে চায়, কি তার কথা আছে। আর—

আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন তাঁহার গলায় যেন বাধিয়া গেল।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, আর কি মা? থেমে গেলে যে!

দীপকেরও গলার স্বর ভারী, কথাগুলি কাটা কাটা।

মা বলিলেন, শোভনা, সে নাকি আবার এসেছিল।

কথাটা শুনিয়া শোভনা এমন করিয়া নড়িয়া উঠিল যে, যে চৌকীটাতে তাহারা বসিয়াছিল, সেই চৌকীটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

নয়নতারা একটু পরে আবার বলিলেন, সে মালীর কাছ থেকে আমাদের ঠিকানা নিয়ে গেছে। মালী লিখেছে তার একটা হাত নাই, কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, কে মা?

শোভনা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, না মা, না না। কিছু বোল না তুমি, এ আমি সহ্য করতে পারব না।

নয়নতারা দীপকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, একজন সন্ন্যাসী, দীপক। তোমার যে দিন জন্ম হয়, সে দিন খুব ঝড় জল, তারই মধ্যে সে হঠাৎ কোথা থেকে এসে কর্ত্তার কাছে বলে গেল, আপনার এই সন্তানটি রাজা হবে, নয় ত—

দীপক উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নইলে কি হবে তিনি বলেছিলেন?

নয়নতারা বলিলেন, নইলে ভিখারী হবে।

দীপক যেন কথাটা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, মা, তিনি ঠিক বলেছেন, আমি ভিখারী হতে চাই। আমি চাই মনে প্রাণে আমি ভিখারী থাকব। এইটুকু সংসারের ভিতর আমার এতবড় পৃথিবীটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি! আর দেখছি ক্ষণে ক্ষণে মানুষের ঐশ্বর্য্যের লালসা মানুষকে ক্ষিপ্ত বর্ব্বর ক'রে তুলছে। কিন্তু মানুষ কি এমনি করে আর বেশীদিন চলতে পারবে! আমি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি এ আমার অভিমান, মানুষের কাছে আমার অভিযোগ।

নয়নতারা বলিলেন, তুমি যা ভাল মনে করেছ তাতে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এ অভিমানের কতটুকু মূল্য? কে তোমাকে জানে, কে তোমাকে বুঝবে? তোমার এই বিদ্রোহে সংসারের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না। এই যে পৃথিবীতে বন্যার বেগ, এর মুখে পড়ে তোমাকেই ভেসে যেতে হবে। কত বড় বড় লোক গেছে, তুমি ত কতটুকু, কত ছোট।

দীপক উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, না না মা, আমি ছোট নই। আমি কতটুকু নই। আমার মধ্যে আমি যাকে দেখতে পাচ্ছি সে অনেক বড়, অনেক শক্তিমান, আমার ধারণার অতীত সে। আমি তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। আমি তাকে যত বলি, এই তোমার পরিবার পরিজন, এই অভাব অনটন, এ সবের দিকে তুমি আগে দেখ, তাহলেই যথেষ্ট হবে।

সে বলে, তা ত সত্য, তা ছাড়াও আর একটা সত্য আছে যে, আমার সংসার পরিবার এই মস্ত বড় পৃথিবীটার একটা অংশ মাত্র। এর এক দিকের একটা ছায়া, একটা ছোট্ট ছবি।

এই এতবড় একটা যুদ্ধ চলেছে, এই যুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি টান্ ধরেছে, তবু আমারই মধ্যের ঐ দীপক লাফিয়ে পড়তে চায় ঐ রক্তের স্রোতে। মানুষের ঐ বিপুল লালসা ও রক্তের প্রবাহের মধ্যে সে তাদের চোখের সামনে প্রাণ বলি দিতে চায়, একবার চীৎকার করে, বলতে চায় আমার প্রাণ নিয়ে তোমরা শান্ত হও। মা, আমি কত বোঝাই তাকে, সে বলে আমার একটা প্রাণই যথেষ্ট। তারা বুঝবে, তারা শান্ত হবে। খুব আশ্চর্য্য না মা! এ কি তাদের চাইতে বড় পাগল নয়?

নয়নতারা বলিলেন, জানি বাবা, ঐ ক্ষ্যাপা মানুষটাই চিরকাল ধরে অনেক মানুষকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু সংসার শান্ত হয় নি। যারা প্রাণ বলি দিতে চেয়েছিল, তারা প্রাণ দিয়ে গেছে—কিন্তু পৃথিবীর যুদ্ধ তেমনি চলেছে। এ থামতে পারে না। পৃথিবীর এই রেষারেষি থামতে পারে না; কেউ থামাতে পারে নি।

একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু দীপক, নিজের পরিবারটাও ত অবহেলার জিনিষ নয়। আশে পাশের আত্মীয় বান্ধব, পরিচিত অপরিচিত এই যে এক একটা মানুষের এক একটা ছোট পৃথিবী এর কথাও ত অনেক ভাববার আছে। এর মধ্যেও দুঃখ আছে, দৈন্য আছে,

সংগ্রাম আছে, প্রীতি আছে, অপ্রীতি আছে, এইটুকু পৃথিবীকেই ত মানুষ ঠিক করে রাখ্‌তে পারে না।

দীপক জোর করিয়া বলিল, রাখ্‌তে পারে না ঐ বড় পৃথিবীটার জন্য। ও যেমন চলছে, আমাদের প্রত্যেকের ছোট পৃথিবীগুলোও তেমনি করে চল্‌তে বাধ্য।

নয়নতারা বলিলেন, বেশ মান্‌লাম। কিন্তু দীপক, তোমার চাকরি ছাড়াতে বড় পৃথিবীটার কতটুকু আঘাত লাগ্‌ল?

দীপক ঘরের ভিতর ঘুরিতেছিল, মা'র কথায় হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল, লাগল না মা? নিশ্চয় লেগেছে। ঐ যে আমার আপিসের কটা বড়লোক, আপিসের কর্ত্তা, তাদের মনে কি আমার চাকরি ছাড়ায় একটুও ঘা লাগে নি মনে কর মা? নিশ্চয় লেগেছে। যখন তারা নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে পরকে বঞ্চিত করতে ব্যস্ত, যখন তারা দেখ্‌ছে চাকরি যাবার ভয়ে সমস্ত কর্ম্মচারী শঙ্কিত, ত্রস্ত, তখন আমার মত একটা সামান্য কর্ম্মচারী নিজের ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিল। এই অসম্ভব ব্যাপারটা কি তাদের মনে একটুও ঘা' দেয় নি? তারা কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এর কারণ কি ভাবতে চেষ্টা করে নি?

নয়নতারা বলিলেন, নাও করতে পারে।

না, করেছে, তা' আমি জানি। কারণ আমার আর্জ্জি পেয়েই তার পরের দিন আমাদের বড়সাহেব আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, চাকরি ছাড়ার কারণ কি? আমি উত্তর করলাম,এ আমার অভিযোগ। তোমাদের কার্য্যপদ্ধতির এই ব্যতিক্রম আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে, তাই আমি তোমাদের বোঝাতে চাই, তোমরা কতবড় অন্যায় করছ। সাহেব আমার কথা শুনে একটু একটু হাসছিলেন বটে, কিন্তু আমি আমার কথা বল্‌তে ছাড়ি নি। আমি স্পষ্ট বলেছিলাম, এতদিন, এতকাল ধরে যে সব কর্ম্মচারী তোমাদের প্রতিষ্ঠা ও বিত্তের সংস্থান করল আজ হঠাৎ তোমাদের অসুবিধা হওয়াতে তাদের তোমরা চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছ। তারা মজুর, মজুরী করে তোমাদের কাছে পয়সা নিত, তার বেশী না। কিন্তু তাদের সে অন্নের সংস্থান আজ তোমরা বন্ধ করলে। তোমরা বাঁচবে, তাদের সাহায্যে তোমাদের বিত্তের ভাণ্ডারে যা সঞ্চিত হয়েছে, তা' দিয়ে তোমরা ঘোর দুর্দ্দিনেও বাঁচবে। কিন্তু তারা যাবে কোথায় বল ত? আজ সমস্ত ধনিকের দ্বার রুদ্ধ। এত বছর যারা তোমাদের সেবা করল, তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা তাদের এ দুঃসময়ে কোনও মতে রাখ্‌তে পারতে না?

শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব তার উত্তরে তোমাকে কি বল্‌লেন?

দীপক বলিল, কি আর বল্‌বেন? তিনি বল্‌লেন, তোমাকে ত আর আমরা ছাড়িয়ে দিচ্ছি না, তুমি কেন চলে যেতে চাও! এ সময়ে চলে গেলে তোমারও ত বিপদ কম হবে না।

আমার তাতে আরও খারাপ লাগ্‌ল, বল্‌লাম, সাহেব, সে বিপদ আমি নিজে যেচে নিচ্ছি। আর আশা করছি আমার এই সামান্য প্রতিবাদ তোমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করবে। আমি জানি তোমাদেরও খুব দুর্দ্দিন, কিন্তু তবু কি তোমরা এতগুলি লোককে বাঁচিয়ে রাখবার মত একটা কোনও পথ বের করতে পারতে না!

নয়নতারা ধীরে ধীরে বলিলেন, কিন্তু এখন আমাদের উপায়?

দীপক একটু ভাবিয়া বলিল, উপায় একটা করবই, না পারি, না খেতে পেয়ে মরে যাব! যাদের বাঁচবার কোনও পথ নেই তারা ত মরবেই। বড়লোকেরা ত সেই কথাই বলে। আমি নিজের কানে শুনেছি, পৃথিবীর পনেরো আনা দরিদ্র লোকের মরে যাওয়াই উচিত; তাদের বাঁচবার ত কোনও দরকার নেই এই কথাই তারা বলে। মা, কিন্তু তারা যখন ওসব কথা বলে তখন তারা বোধ হয় ভুলে যায় মানুষ কেহই অমর নয়।

নয়নতারা কি ভাবিতেছিলেন। শেষের দিকে দীপকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া একটু চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাবা, তোমরাও ত এককালে এক রকম বড়লোকই ছিলে।

দীপক উত্তর করিল, হাঁ মা, বড়লোক ছিলাম বলেই শিশুকাল থেকে এই বড়লোকের সন্তান হওয়ার যা-কিছু নির্য্যাতন তা সহ্য করেছি। বাবাকে আমি দেখি নি।

তাঁর কথা লোকের মুখে যা' শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে ও রকম বড়লোক হওয়া অপরাধের নয়। কিন্তু বড়দাকে দেখেছি খাঁটি বড়লোক। যে আত্মাভিমান বড়লোককে অবিবেচক করে, তাঁর সেটা ছিল। তাই ছোট বেলা থেকেই নিজেদের পরিবারের ওপর আমার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে।

শোভনা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, কথাটি বলে নাই। কিন্তু আর যেন নীরব থাকিতে পারিল না। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, কি তোমরা বড়লোক ছিলে বলে' অভিমান করছ! একে কি বড়লোক বলে? একটা গাড়ী ঘোড়া পাঁচটা চাকর বাকর থাক্‌লেই কি তাকে বড়লোক বলে? এমন ত অনেক লোকেরই থাকে। বড়লোক ছিলেন আমার শ্বশুর। তাই তাঁর অত্যাচার তোমরা মুখ বুজে সহ্য করেছ। তিনি যে দিন আমাকে অপবাদ দিয়ে বাড়ীর বার করে দিলেন, সে দিন বড়লোকের কথাই রইল, বাবা আমাকে বিনা আপত্তিতে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। বড়লোক হ'লে তা' পারতেন না।

নয়নতারা বুঝিলেন, আজ সন্ধ্যার সময় ঐ সন্ন্যাসী আসার খবরটা পাওয়াতেই শোভনার মনে ঐ সব পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, কর্ত্তা যদি তখন ঐ সব বিশ্রী কথা নিয়ে গোলমাল করতেন, তা হলে কি তোমার পক্ষে বা তোমার ছেলের পক্ষে এর চাইতে ভাল কিছু ব্যবস্থা হোত মনে কর? নিজের মান নিজের হাতে এ কথা বিশ্বাস করত? ছেলেটিকে ত তারা আটকে রেখেছিল, কিন্তু রইল কি? সে বড় হয়ে যে দিন তারই ঠাকুর্দ্দার মুখে শুনল, তার জন্ম তার মাকে কলঙ্কিত করেছে, তারপর থেকে তাকে বড়লোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্যও ত ধরে রাখতে পারে নি!

নয়নতারার প্রত্যেক কথাটি যেন দেয়ালের গায়ে লাগিয়া লাগিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল।

শোভনা নিরুদ্ধ আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, মা, আমি ওকে দেখা দেব। আমি ওকে সব কথা বল্‌ব। বিশ্বাস না করে, তারপর যা হয় হবে। এবার এলে ওকে আমার কাছে আস্‌তে দিও।

দীপক ঐ গভীর স্তব্ধতার মধ্যে কাহার যেন পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। দূরে, অনেক দূরে। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, কে যেন এল।

নয়নতারাও একটু কান পাতিয়া থাকিয়া বলিলেন, বোধ হয় রজত এল।

রজতই আসিল। ঘরের দরজা অবধি আসিয়া বলিয়া উঠিল, প্যাঁচার মত এই অন্ধকার ঘরে বসে তোমরা কি করছ?

নয়নতারাই উত্তর দিলেন। বলিলেন, না, এই বসে নানা কথা বলছিলাম।

রজত ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, মা, কল্যাণকে আজ আবার পথে দেখ্‌লাম। তার একটা হাত বোধ হয় কেটে গেছে। আমাকে সে দেখতে পায় নি।

ঝণ্‌ ঝণ্‌ করিয়া একটা কাঁশার গেলাশ মাটিতে পড়িয়া গেল। শোভনা আবার তাহা তুলিয়া রাখিল।

নয়নতারা বলিলেন, তারই কথা হচ্ছিল রজত। দীপক ত বিশেষ কিছু জানে না। আর আমার ইচ্ছাও ছিল না, দীপক আর এ সব কথা জানুক। যাক্‌, আজ প্রত্যেকের অজ্ঞাতসারেই কথাটা কথায় কথায় উঠে পড়েছিল। আজ আমরা ভাবছিলাম, এবার সে এলে বা তার দেখা পেলে তাকে বুঝ্‌তে দেওয়া যে আমরা তাকে চিনি। দীপকের জন্মের দিনও সে যখন এলো, তোমার বাবা তাকে জান্‌তেও দেন্‌ নি যে, তিনি তাকে চিন্‌তে পেরেছেন! তা' সে ত অনেক দিন হয়ে গেছে। এখন ত সে অনেক বড় হয়েছে।

রজত বলিল, হ্যাঁ মা, আজ ওকে দেখে আমিও ভাবছিলাম। ওকে দেখে এখন দিদির ছেলে বলে কারুর মনে হবে না। দিদিকেই ওর মেয়ে বলে মনে হবে। কি বিরাট দেহ, চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে, দিন দিন যেন ওর রংটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে।—বয়স ত ওর কম্‌ হোল না। কিন্তু দেখ্‌লে পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী মনে হয় না।

নয়নতারা বলিলেন, তাই হবে। শোভনা তোমার মাত্র দেড় বছরের বড়। তোমরা দু'জনেই খুব কাছাকাছি

হয়েছিলে। আর সব ছেলে মেয়েরা প্রায় আড়াই বছর করে তফাৎ ছিল।

দীপক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আরো, অনেক ভাই বোন্ ছিলাম, না মা?

নয়নতারা বলিলেন,হ্যাঁ বাবা,তারা সব বেঁচে থাকলে—বোধ হয় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। নয়নতারা কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না।

রজত বলিল, ঘরে একটা আলো আনো না।

শোভনা উঠিয়া গেল, কিন্তু আলো লইয়া আসিল বিমলা।

দীপক বলিল, সত্যি দিদিকে এত ছোট্টটি দেখায়, আমার এক এক সময় মনে হয় যেন আমারও ছোট।

নয়নতারা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেরা খেয়েছে?

বিমলা বলিল, হ্যাঁ মা, তারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়নতারা বলিলেন, তবে যাও মা এবার এদের খাবার জোগাড় কর গে।

বিমলা চলিয়া গেলে দীপক জিজ্ঞাসা করিল, মা, ঐ সন্ন্যাসীই কি দিদির ছেলে?

নয়নতারা বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার দিদির স্বামীও আছেন। তবে তিনি এখন আর মানুষের মত নাই। আগেও মনের জোর তাঁর খুব কমই ছিল। তারপর শোভনার এই ব্যাপারের পর থেকে সে একেবারে কেমন যেন হয়ে গেছে। কেবল মদ খায় আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

দীপকের কৌতূহল বাড়িয়া গেল। সে তাই আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা ব্যাপার ব্যাপার বল্‌ছ, কিন্তু সেটা যে কি তা' কিছু বল না। সব কথাবার্ত্তা শুনে আমার ত মনে হয়েছে, মোটের ওপর কেবল দিদির উপরই অন্যায় করা হয় নি, দিদির স্বামী ও ছেলের উপরও অন্যায় করা হয়েছে।

নয়নতারা বলিলেন, এখন তোমরা বড় হয়েছ, সবটা তোমাদের এখন জানাই উচিত। তোমার দিদির বিয়ে হয় খুব ছোট বয়সে। তোমাদের ভগ্নিপতি অমরেরও বয়স তখন খুব কম। শোভনার শ্বশুর খুব বড়লোক ছিলেন। শোভনাকে দেখে তিনি প্রায় জোর করেই নিয়ে গেলেন। শোভনাকে খুব আদর করতেন, তবে যেন একটু বেশী বেশী। শোভনা প্রথমটা তত বোঝে নি। একটু বড় হয়ে তাঁর আদরটাদরগুলো শোভনার ভাল লাগ্‌ত না। সে কথা সে অমরের কাছে বলেছিল। কিন্তু ফল হোল অন্য রকম। অমর শোভনাকেই সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। একবার দিন সাতেকের জন্য অমর তাদের জমীদারী দেখ্‌তে মহালে যায়। শোভনার শরীরটা তখন একটু খারাপ! এরই মধ্যে একদিন রাত্রে শোভনার শ্বশুর একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেন। শোভনার শাশুড়ী ছিল না। কাজেই তাকে কোনও রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে অমর ফিরে আসা পর্য্যন্ত চুপ করেই থাকতে হয়।

রজত বলিয়া উঠিল, একটা পাষণ্ড, ওসব লোককে গুলি করে' মারতে হয়।

নয়নতারা বাধা দিয়া বলিলেন, তোমার বাবাও তাই চেয়েছিলেন, আমিই তাঁকে শান্ত করি। গুলি করলে শোভনার ওপর এ রকম অত্যাচার হয় ত শান্ত হোত কিন্তু দুর্নাম শান্ত হোত না।

দীপক বলিল, আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি তুমি সমস্ত অপবাদটা দিদির ঘাড় দিয়েই বইয়ে নিলে, আর যারা সত্যিকারের অপরাধী তারা নির্ব্বিবাদে সমাজে সাধু বলে চলে গেল! এই করেই ত সমাজটার এই অবস্থা করে তুলেছ!

নয়নতারা স্বীকার করিলেন, হাঁ তা' করেছি। অমর যখন বাড়ী ফিরে এলো শোভনা তাকে সব বল্‌ল। আর তার দুর্ভাগ্য এমন কল্যাণ তখন পেটে। এ ঘটনার কিছুদিন পরে অমর যখন সে কথা শুন্‌ল, অমর বুঝতেও চেষ্টা করল না এ সন্তান তারই। শ্বশুর দেখলেন তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেবার এই উপযুক্ত সুযোগ।

দীপক লাফাইয়া উঠিয়া আলোটা আরও বাড়াইয়া দিল। সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। ঘরের এ-ধারে ও-ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নয়নতারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, শোভনার আরও

দুর্ভাগ্য। অমরের এক বন্ধু তাদের বাড়ীতে থাকত। বেকার লোক, অমরের তোষামোদ করে বেশ সুখেই ছিল। অমরের বাবা তাকে দিলেন এই ব্যাপারে জড়িয়ে। তোমার বাবাকে চিঠি লিখলেন, সঙ্গে সঙ্গে শোভনাও সব কথা খুলে লিখ্‌ল। আর লিখে পাঠাল, বাবা যেন তাকে নিয়ে যেতে না আসেন। সে শ্বশুরবড়ীতেই থাকবে।

দীপক রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল, দিদিটা একেবারে অপদার্থ। তাদের মুখে লাথি মেরে চলে আস্‌তে হয়!

নয়নতারা বুঝাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ দীপক, সবটা শুনে তাই মনে হয়। আমারও তাই মনে হয়েছিল! কিন্তু শোভনা জোর করে' বলল, স্বামীর বাড়ীতেই আমার সন্তান হবে। তাই হোল। দীর্ঘ দশ এগার মাস অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে তার দিন কাটে। কল্যাণের জন্মের পরও সে কয়েক বছর জোর করেই সে বাড়ীতে ছিল। কিন্তু যে দিন অমর আর তার বাবা কল্যাণের সামনেই কুলটা বলে' তাকে একদিন বেরিয়ে যেতে বল্‌লেন সেদিন সে আর থাক্‌তে পারল না। এতদিনের নিরুদ্ধ বেদনা তাকে কষাঘাত করে শ্বশুরের গৃহ ছাড়াল। শ্বশুর ছেলেটিকে জোর করে আট্‌কে রাখলেন। তারপর ত প্রায় সবই জান।

দীপক বলিয়া উঠিল, মা, সেই অমরবাবু স্বামী হয়ে স্ত্রীর এই অপমান সে সহ্য করল? মা, তোমরা বল ভগবান আছেন। কিন্তু কোথায় সে? আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি বড়লোক হব। বেশ বুঝতে পারছি; আত্যাচারীকে দমন করতে হলে চাবুক দিয়ে করতে হয়, নিজেকে বঞ্চিত করে নয়।

বিমলা আসিয়া বলিল, তোমাদের খাবার দেওয়া হয়েছে ঠাকুর-পো।

—ক্রমশ

ছবি ও মায়া

শ্রীক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার

জনহীন নিস্তব্ধ গভীর ঘনবনে
কার এ অট্টালিকা দীর্ণ শত বরষের,—
অয়ি, পরিত্যক্তা সম নীরব রোদনে
জাগাইছ অপূর্ব্ব বেদনা! যাহাদের
আশ্রয় আছিলে কোথা তারা জাননা জননী!
রাত্রিদিন একা উদাসিনী এ গহনে!
অতীত কাহিনী শত, মুদ্রিত নয়নি
কেবলি ভাবিছ বসি।
ঝিল্লির সনে
আজি এ সন্ধ্যায় বিষাদ গাহিতে চাহে
এ বিদীর্ণ প্রাণ বহুপূর্ব্ব ইতিহাস
অস্ফুট প্রাচীন কথা—গৌড় গাথা যাহে
মৃত-মাতৃ-স্নেহ কণ্ঠের তুলেছে আভাস।
ক্রমে নিশি গাঢ়তম আসিছে ঢাকিয়া
একটি জিজ্ঞাসা, ব্যথায় উঠিছে ভাসিয়া।

মীনকেতন

ন্যুট্ হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ষোলো

এর থেকে আর কি হবে বল? যা হবার হোক্, চুপ করে' থাকব। আমিই কি গায়ে পড়ে' ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ করেছি? কক্ষনো না, ওর যাবার পথে একদিন আমি একটু দাঁড়িয়েছিলাম শুধু। কি সুন্দর গ্রীষ্ম এখানে! সূর্য্যের আলো পেয়ে মানুষ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ওরা ওদের নীল চোখ দিয়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওদের ঐ ভুরুর তলায় কিসের অভিসন্ধি? যাক্, আমি সবার 'পরেই উদাসীন,—একদিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরছি খুব,—রাতে শুধু আমার কুঁড়ে ঘরে চোখ মেলে শুয়ে থাকি।

"এড্ভার্ডা, তোমাকে চারদিন দেখিনি।"

"চারদিন? হাঁ, তাই। কিন্তু আমি এত ব্যস্ত ছিলাম, দেখ্বে এস।"

একটা বড় ঘরে আমাকে নিয়ে এল। টেবিল চেয়ার সব ওলোটপালোট, ঘরের একেবারে অদলবদল হয়ে গেছে। বেলোয়ারী ঝাড়, ষ্টোভ্—সব কিছুই সুন্দর করে' সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো। পিয়ানোটা কোণে দাঁড়িয়ে।

এই সব ওর নাচের সরঞ্জাম।

"তোমার কি রকম লাগ্ছে?" ও শুধোয়।

"চমৎকার!"

ঘরের বাইরে এলাম।

বল্লাম, "এড্ভার্ডা, তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?

'কি বল্ছ বুঝ্ছিনা," ও অবাক হয়ে বল্লে, "দেখ্ছ ত' কাজে কত ব্যস্ত ছিলাম। কি করে' আসি তোমাকে দেখ্তে?"

"না, আস্তে পার না বটে।" সায় দিলাম। এক'দিন ভারি অসুস্থ ছিলাম, ঘুমুতে পারিনি, তাই কি রকম আবোল তাবোল বক্ছিলাম বুঝি। সমস্ত দিন ধরেই মন অত্যন্ত বেজুত লাগ্ছে। 'না, তুমি আসনি বটে, ... কিন্তু, কি যেন হয়েছে, তুমি বদলে গেছ। তোমার ঐ দুটি ভুরুর টানে যেন রহস্য রয়েছে, এখন তা বুঝ্তে পারছি।"

"কিন্তু আমি ত' তোমাকে ভুলিনি।" লজ্জার ভাণ করে' ও ওর বাহু আমার মধ্যে প্রসারিত করে দিল।

"হয়ত আমাকে ভোলনি। তাই যদি হয় তবে কি বল্ছি আমি এ সব।"

"কাল তুমি এক নেমন্তন্ন পাবে। আমার সঙ্গে নাচতে হবে কিন্তু। কেমন দুজনে আমরা নাচ্ব!"

"এখন? না, এখন না। ডাক্তার এখুনি এসে পড়বে অনেক কাজ এখনো পড়ে' আছে। ঘর সাজানো তা হলে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে?

একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল।

"ডাক্তারই হাঁকাচ্ছে দেখ্ছি।" বলি।

'হাঁ, ওকে একটা ঘোড়া পাঠিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল—'

"ওর খোঁড়া পা-টাকে জিরোতে দিতে, না? আচ্ছা,

আমি চল্লাম। শুভদিন ডাক্তার, আপনাকে দেখে খুসী হলাম ফের। বেশ ভালো ত? আমি যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না ...”

সিঁড়িতে নেমে আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম। এড্‌ভার্ডা জানালায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখ্‌ছে,—দুইহাত দিয়ে জান্‌লার পর্দ্দা টেনে ধরেছে,—ওর চোখে নিবিড় ঔদাস্য। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাই,—অন্ধকারে চোখ যেন ছেয়ে এসেছে; আমার হাতের বন্দুকটা ছড়ির মতই হাল্কা। যদি ওকে পেতাম ত' একেবারে ভালো হয়ে যেতে পার্‌তাম,—এই খালি মনে হচ্ছিল। বনে পৌছুলাম; ফের মনে হল, ওকে যদি পেতাম,—সবার চেয়ে বেশী সেবা করতাম ওকে; যদি ও অপকৃষ্টই প্রতিপন্ন হত, কোনোদিন তবু ওকে ছাড়তাম না কোনোদিন, আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত ওকে পেড়ে দিতাম,—এই ভেবেই সুখ হত, ও আমার—খালি আমার। ... থাম্‌লাম, হাঁটু গেড়ে বসে' পড়্‌লাম, কয়েকটি ঘাসের ডগা চুম্বন কর্‌লাম, এই আশা করে,—যেন ওকে পাই;—পরে উঠে পড়্‌লাম।

মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। সময়ে ওর আচার ব্যবহারেরই যা একটু বদল হয়েছে,—ও কিছু নয়। যখন চলে' যাই ও আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল,—যতক্ষণ না দেখা যায় ততক্ষণ ওর চোখ দিয়ে ও আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে,—এর বেশী আর কি করবে ও? আনন্দে একেবারে অবশ হয়ে গেলাম, ক্ষুধা পর্য্যন্ত ঘুচে' গেল।

ঈশপ আগে আগে ছুটছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। দেখি, কুঁড়ের কিনারায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় শাদা রুমাল বাঁধা। এভা—কামারের মেয়ে।

“নমস্কার এভা!”

ধুসো পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে,—ওর মুখ রাঙা,—একটি আঙুল ও চুষ্‌ছে।

“একি এভা? কি হয়েছে?”

“ঈশপ আমাকে কাম্‌ড়েছে।” অপ্রস্তুতের মতো হঠাৎ বলে' ফেলে ও চোখ নামাল।

ওর আঙুলটি দেখ্‌লাম। ও নিজেই কাম্‌ড়েছে। হঠাৎ কি মনে করে' বল্লাম, “অনেকক্ষণ ধরে' দাঁড়িয়ে আছ?”

“না, বেশিক্ষণ নয়।” ও বল্লে।

আর কোনো কথা নেই,—ওর হাত ধরে ওকে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে এলাম।

সতেরো

মাছধরা শেষ করে'ই নাচঘরে এলাম বন্দুক আর ব্যাগ নিয়ে—সব চেয়ে ভালো পোষাকই পরে' ছিলাম। সিরিল্যাণ্ড্‌-এ যখন পৌছুলাম, বেশ দেরী হয়ে গেছে,—ভেতরে ওদের নাচ শুন্‌তে পাচ্ছি। খানিক বাদে কে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—“এই যে আমাদের শিকারী, লেফ্‌টেনেন্ট্‌। জন কয়েক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কি মাছ ও পাখী ধরেছি তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এড্‌ভার্ডা মৃদু একটু হেসে আমাকে অভিবাদন জানালে,—ও নাচ্‌ছে, ওর সর্ব্বাঙ্গ যৌবন ছটায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

“আমার সঙ্গেই প্রথম নাচ্‌বে এস!” ও বল্লে।

দু' জনে নাচ্‌লাম। উদ্ভট কাণ্ড কিছুই ঘট্‌লনা,—মাথা ঘুরছিল বটে, কিন্তু পড়িনি। আমার ভারী বুট্ দুটো খুব আওয়াজ করছিল,—নিজেরই ইচ্ছা হচ্ছিল, আর নেচে কাজ নেই। ওদের রঙ্‌চঙে মেঝেটা পর্য্যন্ত নষ্ট করে' দিয়েছি। কিন্তু এর বেশি আর কিছু বিতিকিচ্ছি কাণ্ড যে হল না, এ জন্য ভারি খুসি ছিলাম!

ম্যাক্‌-এর সহকারী দু'জন প্রাণপণে নাচ্‌ছে—ডাক্তার প্রায় প্রত্যেকে জোড়া-নাচেই যোগ দিচ্ছে। এ ছাড়া আরো চার জন যুবক ছিল। এক বিদেশী,—মুসাফের বণিকও,—কি সুন্দর ওর গলা, বাজ্‌নার সঙ্গে তাল দিচ্ছে,—খানিক বাদে বাদেই পিয়ানো বাজিয়ে বাজ্‌নাওয়ালী মেয়েদের শ্রান্তি লঘু কর্‌ছে।

রাতের গোড়ার দিকের কথা মনে নেই তত,—কিন্তু রাত যতই ঘনিয়ে আস্‌ছিল,—একটি কথাও তার ভুলিনি।

জান্‌লা দিয়ে সূর্য্য চেয়ে আছে—সিন্ধুশকুনের দল ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। মদ আর রুটি,—গান আর হৈ চৈ,—সমস্ত ঘরে এড্‌ভার্ডার হাসি হিল্লোলিত হচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর কি একটিও কথা নেই আজ? ও যেখানে বসে' আছে, এগিয়ে গেলাম; ইচ্ছা হল খুব নম্র হয়ে ওকে দু'টি কথা কই—ওর পরনে কালো পোষাক, দীক্ষার সময়কার হয়ত,—এখন কিন্তু ওর গায়ে খুব ছোট হয়ে গেছে! কিন্তু নাচ্‌বার বেলা ঐ পোষাকে ওকে ভারি চমৎকার মানায়, ইচ্ছা হ'ল এই কথাই ওকে বলি।

"এই কালো পোষাক .." সুরু কর্‌লাম।

কিন্তু ও উঠে পড়ে ওর এক মেয়ে-বন্ধুর কোমরে হাত জড়িয়ে চলে গেল। বার দুই তিন এ রকম হতে লাগ্‌ল। বেশ,—তাই বটে ... কিন্তু, তা হ'লে আমার যাবার বেলায় ও কেন চোখে অমন নিঃশব্দ বেদনা ভরে' জান্‌লায় এসে দাঁড়ায়? কেন?

একটি মহিলা আমাকে নাচ্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন। এডভার্ডা কাছেই বসে ছিল, জোরে বল্লাম, "না, আমি এখ্‌নি বাড়ী যাচ্ছি।"

এড্‌ভার্ডা জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চাইল। বল্লে—"যাচ্ছ? না, তুমি যাবে না।"

চম্‌কে উঠ্‌লাম, নিজের ঠোঁট কাম্‌ড়াচ্ছি বুঝি,—উঠে পড়্‌লাম।

"তোমার কথায় বেশ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে।" উদাসীনের মতো বলে' দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

ডাক্তার পথ আট্‌কাল, এড্‌ভার্ডা তাড়াতাড়ি পিছু নিলে। গাঢ় গলায় বল্লে,—"আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি বল্‌ছিলাম, সব্বাইর শেষেই তুমি যাবে,—এখন ত' মোটে একটা। ... আর, শোন"—ওর দুই চোখ ডাগর হয়ে উঠেছে—"তুমি আমাদের মাঝিকে পাঁচটা টাকা দিয়েছ,—সেই আমার জুতোটা বাঁচিয়েছিল ব'লে? এ তোমার বাড়াবাড়ি।" প্রাণ খুলে হেসে ও সবাইর দিকে তাকাল।

আমি হাঁ হয়ে গেলাম,—বিমূঢ়, নির্ব্বাক।

"ঠাট্টায় তোমার বেশ দক্ষতা আছে। আমি কোনোদিন তোমার মাঝিকে পাঁচটাকা দিইনি।"

'দাওনি?" ও রান্নাঘরের দরজা খুলে মাঝিকে ডেকে আন্‌লে। "জেকব্‌, তোমার মনে আছে সেই কর্‌হোল্‌মার্শ-এ একদিন তুমি আমাদের নৌকো করে' নিয়ে গেছ্‌লে, আমার জুতো জলে পড়ে' গেল,—তুমি বাঁচালে? মনে নেই?"

"আছে।" জেকব্‌ বল্লে।

"আর, তার জন্য তোমাকে পাঁচটাকা দেওয়া হ'ল?"

"হাঁ, আপনি দিয়েছিলেন ..."

"আচ্ছা, আচ্ছা, যাও,—তাই—যাও।"

কি মানে এই চাতুরীর? আমাকে কি ও লজ্জা দিতে চায়? পার্‌বেনা,—লজ্জায় আমি কখনোও নুয়ে পড়্‌বনা। জোরে ও স্পষ্ট করে' বল্লাম—"এখানে সবাইকে বলে' রাখা ভাল,—এ হয় ভুল, নয় মিথ্যা কথা। তোমার জুতো রক্ষা করবার জন্য মাঝিকে পাঁচ টাকা দেবার কথা আমার মনেই হয়নি। দেওয়া অবশ্য উচিত ছিল,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঘটে ওঠেনি তা।"

ভুরু কুঁচ্‌কে ও বল্লে—"নাচ বন্ধ হয়ে গেল কেন? ফের সুরু হোক্‌।"

হ্যাঁ,—এ কথার ওর উত্তর দিতে হবে, ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম। ও একটা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল,—আমিও গেলাম।

একটা গ্লাশ মুখের কাছে তুলে ওর স্বাস্থ্য কামনা কর্‌লাম।

"আমার গ্লাশ খালি।" ও শুধু বল্লে।

কিন্তু সাম্‌নেই ওর গ্লাশ,—ভরা।

"ভেবেছিলাম ঐ বুঝি তোমার গ্লাশ।"

"না, আমার না।" বলে' আর কারো সঙ্গে গভীর তত্ত্বালোচনায় ডুবে গেল।

"তা হলে আমাকে মাপ ক'রো।"

অতিথিদের কয়েকজন এই ছোট্ট অভিনয়টি দেখে নিয়েছে।

আমার হৃদয় ছি ছি করে' উঠ্‌ল, আহত সুরে বল্লাম,—"কিন্তু ও কথা তুমি কেন বল্‌লে, আমাকে বুঝিয়ে দাও..."

ও উঠে আমার দুটি হাত ধরে' আকুল হয়ে বল্লে,—

আজ না, এখন নয়। আমি এত কষ্ট পাচ্ছি আজ। তুমি আমার দিকে এ রকম করে' তাকাচ্ছ কেন? আমরা এককালে বন্ধু ছিলাম ...”

বুক ভরে' উঠ্‌ল, নাচ্‌ওয়ালাদের কাছে গেলাম।

খানিকবাদে এড্‌ভার্ডাও এল, সেই মুসাফির যেখানে বসে' পিয়ানোয় একটা নাচের গৎ বাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে ও বস্‌ল। ওর মুখ যেন দুঃখে করুণ।

নিবিড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, “কোনোদিন বাজাতে শিখ্‌লাম না। যদি পার্‌তাম।”

কি জবাব দেব এর? আমার হৃদয় ওর দিকে এত নুয়ে রয়েছে, ওর দিকে উড়ে গেছে একেবারে। বল্লাম,—“তুমি হঠাৎ এ রকম ম্লান হয়ে গেলে কেন এড্‌ভার্ডা? দেখে আমার এত কষ্ট হচ্ছে, তুমি যদি জান্‌তে।”

“কেন, জানিনা।” ও বল্লে—“সব কিছুর জন্যই হয়ত। ভাল লাগেনা। ইচ্ছে হচ্ছে, সব এবার চলে' যায়, —সব্বাই। না, না, তুমি না,—শেষ পর্য্যন্ত খালি তুমি থাক।”

ওর কথা আবার আমাকে তাজা কর্‌লে, ঘরে রৌদ্র দেখে আমার চক্ষু খুসী হ'ল। ‘ডিন্’-এর মেয়ে কাছে এসে কথা কইছে,—আমার ভালো লাগ্‌ছেনা এখন,—খুব কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছি। ইচ্ছে করেই ওর দিকে তাকাইনা,—ও বলেছিল আমার চোখ নাকি পশুদের মতোই ধারালো। ও এড্‌ভার্ডাকে বল্‌ছিল এবার—একবার এক জায়গায়,—‘রিগায়’ হয়ত—কে একজন ওর পিছু নিয়েছিল রাস্তার পর রাস্তা।

“আমি যে রাস্তায় যাই, ওত সেই রাস্তায়ই আসে, আর আমার দিকে চেয়ে হাসে।” ও বল্লে।

“কেন, লোকটা কি অন্ধ?” বল্লাম, এড্‌ভার্ডাকে খুসী কর্‌তে ঘাড় দুটো নাড়্‌লাম পর্য্যন্ত।

তরুণী আমার কথার কর্কশতা তখুনি বুঝে ফেল্লে, বল্লে—“হ্যাঁ, আমার মতো বুড়ি ও কুৎসিত মেয়ের পিছু যে নেয় সে অন্ধই বটে।”

এড্‌ভার্ডা আমাকে কিছু না বলে' ওর বন্ধুকে নিয়ে চলে' গেল,—ওরা একসঙ্গে মাথা নেড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কি সব বলাবলি কর্‌ছে। তারপর থেকে আমি একেবারে একা।

আরেক ঘণ্টা কাট্‌ল; সিন্ধুশকুনরা জেগে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে; খোলা জান্‌লা দিয়ে ওদের ডাক বুকে এসে লাগ্‌ছে। পাখীদের প্রথম ডাক শুনে আমার শরীর যেন আনন্দে কম্পিত হতে লাগ্‌ল, ইচ্ছে হল—সেই দ্বীপে ফিরে যাই,—একা।

ডাক্তারের মেজাজ খুব দরাজ আজ, সবাইকে খুসী রাখ্‌ছে। মেয়েরা ওর সঙ্গ ও সান্নিধ্যে এতটুকু শ্রান্ত হয় না। ঐ জিনিসটাই কি আমার প্রতিদ্বন্দী? ওর খোঁড়া পা ও কৃশ চেহারা দেখে—এই মনে হচ্ছে। ও বারে বারে অদ্ভুত ভঙ্গী করে' কথাবার্ত্তা কয়, আমি জোরে হেসে উঠি। ও আমার প্রতিদ্বন্দী কিনা, তাই ওকে সমস্ত কিছু সুবিধা করে' দিই,—আর আমি নির্জীব হয়ে চেয়ে থাকি। এখানে ওখানে সর্ব্বত্রই ডাক্তার,—বলি—“ডাক্তারের কথা শোন সবাই।” আর ও যা বলে' তাইতেই হেসে উঠি।

ডাক্তার বল্লে,—“পৃথিবীকে খুব ভালবাসি আমি। দাঁত ও নোখ্ দিয়ে জীবনকে আমি আঁক্‌ড়ে থাকি। আর যখন মর্‌ব, লণ্ডন কি প্যারির কোনোখানে যেন একটু কোণ পাই, আর যেন নাচগানের নির্ঘোষ শুনি,—সব সময়।”

“চমৎকার।” হেসে হেসে গড়িয়ে পড়্‌লাম, দম আট্‌কে এল। একটুও মদ খাইনি কিন্তু।

এড্‌ভার্ডাকেও খুসী দেখাচ্ছে।

অতিথিরা সব বিদায় নিচ্ছে,—পাশের ছোট্ট ঘরটাতে পালিয়ে গিয়ে চুপ করে' বসে' বসে' প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। সিঁড়িতে একের পর এক সবাইর বিদায়জ্ঞাপন শুন্‌তে পাচ্ছি—ডাক্তারও বিদায় নিয়ে চলে' গেল টের পেলাম।—সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। আমার হৃদয় কাঁপ্‌ছিল, কখন ও আসে।

এড্‌ভার্ডা এল। আমাকে দেখে ভারি অবাক হয়ে গেল, হেসে বল্লে—“তুমি আছ? শেষ পর্য্যন্ত যে থেকে

গেলে,—এ তোমার অসীম দয়া। আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি আজ।"

দাঁড়িয়েই রইল।

উঠে পড়ে' বল্লাম,—"তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার তা হ'লে। আশা করি, তুমি আমার ওপর বিরক্ত নও, এড্ভার্ডা। খানিক আগে তুমি ভারি মনমরা ছিলে, আমার এত খারাপ লাগছিল।"

"ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আর কিছু না বলে' দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"ধন্যবাদ। সন্ধ্যাটা ভারি সুখে কাট্‌ল।" দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে আস্‌ছিল, বাধা দিলাম।

"কিছু দরকার নেই। আমি নিজেই পথ চিনে নিতে পারব।"

তবুও আমার সঙ্গে ও এল। আমি আমার টুপি, বন্দুক ও ব্যাগ্ গুছিয়ে নিলাম, ও ততক্ষণ বারান্দাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোণে একটা ছড়ি; বেশ দেখা যাচ্ছিল; ভালো করে তাকিয়ে চিন্‌লাম ওটা কার,—ডাক্তারের। আমি ছড়িটা দেখে ফেলেছি বলে' ও যেন একটু অপ্রস্তুত হল;—ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল ও এর কিছুই জানেনা। গোটা এক মিনিট কেটে গেল,—কোনো কথা নেই! হঠাৎ ও অধৈর্য্যের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—তোমার ছড়ি,—তোমার ছড়ি নিতে ভুলো না।"

আমারই চোখের ওপর ডাক্তারের ছড়িটা ও আমার হাতে তুলে দিল।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম,—ছড়িটা ও এখনো ধরে' আছে, ওর হাত কাঁপ্‌ছে। আমি ছড়িটা নিয়ে আবার কোণে তেম্‌নি ঠেসান্ দিয়ে রেখে দিলাম। বল্লাম—"এ তো ডাক্তারের ছড়ি। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কি করে' খোঁড়া লোক তার ছড়ি ভুলে ফেলে যেতে পারে।"

"খোঁড়া লোক!" ও চীৎকার করে' উঠ্‌ল,—এক প আমার দিকে এগিয়েও এল—"তুমি খোঁড়া নও, জানি,—খোঁড়া হ'লেও তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না, না, কখনোই না। তুমি যাও।"

কিছু বলতে চাইলাম হয়ত, কিন্তু বুক সহসা খালি হয়ে গেছে,—মুখে রা নেই, গভীর নমস্কার করে, দরজার পেছন দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। সামনের দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে যেন কি দেখে নিলাম,—চলে' গেলাম তারপর।

তাই ও ওর ছড়ি ফেলে রেখে গেছে,—মনে হ'ল,—ফের ও ফিরে আস্‌বে ছড়িটা নিয়ে যাবার জন্য। আমিই তা হ'লে এ রাত্রির শেষ অতিথি নই।

আস্তে হেঁটে চলেছি, বনের কিনারে এসে থাম্‌লাম। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই বুঝি খুব জোরে পা চালিয়েছে। ওর কথা কইবার আগেই টুপি তুল্লাম,—ওকে পরখ্ করতে। ও‍ও তুল্‌ল। বরাবর ওর কাছে গিয়ে বল্লাম—"আমি ত তোমাকে কোনো অভিবাদন জানাইনি।"

ও চোখের দিকে চেয়ে রইল।—"অভিবাদন জানাওনি?"

"না?"

চুপ।

"তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।" হঠাৎ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার ছড়িটা ফিরিয়ে আন্‌তে চলেছি,—ফেলে এসেছি কিনা।"

এর কিছু উত্তর দেওয়া যায় না, তাই অন্য দিক দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলাম। ওর সামনে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম—"লাফাও।"

ও যেন একটা কুকুর।

ওর লাফাবার জন্য শিস্ দিলাম।

ওর মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেছে, ঠোঁট কাম্‌ড়াচ্ছে,—ওর চোখের দৃষ্টি মাটিতে মিশে গেছে। হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল,—অস্ফুট হাসিতে মুখ একটুখানি কোমল হ'ল হয়ত,—বল্লে—"তার মানে? কি বল্‌তে চাও তুমি? কি হয়েছে তোমার?"

কিই বা বলুব ? ওর কথা বুঝি মন ছুঁয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ও ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে,— "তোমার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে। বল না কি হয়েছে ? আমাকে বল্‌তে কি বাধা ?"

লজ্জায়, হতাশায় সমস্ত মন নুয়ে পড়্‌ল। ওর শান্ত কথাগুলি আমাকে দস্তর মতো নেড়ে দিলে। ইচ্ছা করল ওর প্রতি আমিও এম্‌নি সদয় হই,—আমার বাহু দিয়ে ওকে জড়ালাম, বল্লাম—"এর জন্য আমাকে মাপ কর ডাক্তার। কিই বা আমার হবে ? কিছুই হয়নি,—তাই তোমার সাহায্যেরও দরকার নেই কিছু। তুমি এড্‌ভার্ডাকে খুঁজছ, না ? বাড়ীতেই ওকে পাবে। শিগ্‌গির যাও, নইলে এখুনি ঘুমিয়ে পড়্‌বে হয় ত'। ও আজ ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,—আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। তোমাকে সব চেয়ে শুভসংবাদ দিলাম,—বাড়ীতেই ওকে পাবে যাও। শিগ্‌গির।"

ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে বন পেরিয়ে কুটীরে এসে পৌঁছুলাম।

এসেই বিছানার ওপর বস্‌লাম,—হাতে বন্দুক, কাঁধে সেই ব্যাগ্‌টা। মনে নানা রকম আজ্‌গুবি চিন্তা ভিড় করছিল। ডাক্তারের কাছে নিজেকে এত খেলো করে' দিলাম কেন ? ওর গলায় বন্ধুর মতো বাহু রেখেছি, ওর দিকে সস্নেহে চেয়েছি—ভাব্‌তে ভারি রাগ হচ্ছিল এখন,—হয়ত এই কথা নিয়ে ও মনে মনে ঠাট্টা করবে,—হয়ত এতক্ষণে এই কথা নিয়ে এড্‌ভার্ডার সঙ্গে ও খুব হাস্‌ছে। আচ্ছা, ও ওর ছড়িটা দেয়ালের কোণে রেখে এল !—হাঁ, আমি যদি খোঁড়া হতাম, তবুও ডাক্তারের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না,—ককখনো না, এড্‌ভার্ডা আমাকে তাই বল্‌লে।

মেঝের মাঝখানে এসে, বন্দুকটা খাড়া করলাম। আমার বাঁ পায়ের পাতার কুঁজো ওপর-পিঠে বন্দুকের মুখটা লাগিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। পা ভেদ করে' গুলিটা মেঝের মধ্যে গিয়ে সেঁধোল। ঈশপ্‌ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

খানিক বাদে দরজায় কে টোকা দিলে।

ডাক্তার।

"তোমাকে বিরক্ত করলাম ব'লে দুঃখিত।" ও বল্লে— "তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে' গেলে, তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে পর্য্যন্ত পারলাম না। বারুদের গন্ধ ?"

ওর মধ্যে একটুও অস্থিরতা নেই।

"এড্‌ভার্ডার সঙ্গে দেখা হ'ল ? ছড়ি পেলে ?" শুধোলাম।

"পেয়েছি। কিন্তু এড্‌ভার্ডা শুতে চলে' গেছে। ... এ কি, তোমার পা থেকে রক্ত পড়্‌ছে ?"

"ও কিছু না। বন্দুকটা সরিয়ে রাখ্‌তে যাচ্ছিলাম,— তাইতেই এ কাণ্ড। কিছু না তেমন। যাও, আমি কি তোমাকে এমনি বসে' বসে' সব গরূচা খবর দেব নাকি ? তুমি বল—ছড়ি ফিরে পেলে ?"

ও আমার কথা যেন শুনলও না; আমার ছেঁড়া বুট ও রক্তাক্ত পায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছড়িটা রেখে ও ওর হাতের দস্তানা খুলে ফেল্লে।

"চুপ করে' বসে' থাক—ন'ড়োনা,—বুট টা আস্তে আস্তে খুলে ফেল্‌ছি।" বন্দুকের এই আওয়াজটাই হয়ত দূর থেকে শুনেছিল।

—ক্রমশ

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

উত্তর

বঙ্গনারী

শ্রাবণ সংখ্যার কল্লোলে প্রকাশিত শ্রীমান্ দিলীপকুমারের 'ভ্রাম্যমানের জল্পনা'য় মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবুকদের কতকগুলি পুরাতন অভিমতই নূতন করিয়া বলা হইয়াছে দেখা গেল। কিছুদিন আগে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি'তেও এই ভাবের কথাই ছিল। তাহা পড়িয়া তখন যাহা মনে আসিয়াছিল, তাহার অল্প কিছু অন্য কথার মধ্য দিয়া সাময়িক পত্রে দুই এক বার প্রকাশ করিয়াছি। 'ভ্রাম্যমানের জল্পনা'য় যাহা বলা হইয়াছে তাহার উত্তর মোটামুটি ঐ সকল আগের লেখার মধ্যেই ছড়াইয়া থাকিলেও শ্রীমান্ দিলীপের লেখাটিরও একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা আবশুক বোধ হইল। কারণ দিলীপকুমার আমাদের নবীন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয়। তাঁহার মতামতও আমাদের শিক্ষিত উন্নতিশীল ছেলেদের মতামতের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর মেয়েদের বিষয়ে নবীনেরাই প্রধান আশা ও ভরসা।

জাহাজে পাশ্চাত্য নর-নারীর আমোদ প্রমোদের দৃশ্যেই কথাগুলি তাঁহার মনে আসিয়াছে। এই বিষয়ে প্রথমেই বলিতে হয়, পুরুষের নারী সাজার যে খেলো আমোদে তিনি জাহাজের মেয়েদের খুসী হইতে দেখিয়াছিলেন, আমাদের কোণের বউরাও তাহাতে মজা পাইতেন কি না তিনি কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? মেয়েদের সকলকেই এত 'সুকুমার চিত্তা' তিনি কি করিয়া মনে করিলেন? তাহা হইলেই কি বিশেষ সুবিধা হইত! যে পুরুষেরা ঐ রকম আমোদে মজা পান, তাঁহাদের প্রণয়িনী, সঙ্গিনীরা তাহাতে আমোদ না পাইয়া উচু চাল চালিলে কি তাহারা খুসী হন? জগতে 'যেমন দেবা তেমনি দেবী' চিরদিনই আছে ও থাকিবে,—তাহা না হইলে চলেও না। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সম্বন্ধেও ইহাই খাটে। আমরা জাতি-হিসাবে ও রকম আমোদে আমোদ না পাইলে আমাদের নর-নারীরাও সাধারণতঃ উহাতে মাতিবে না। ইহার মধ্যে আরও একটি কথা আছে। মেয়েরা আমোদ পান বলিয়াই বিশেষ করিয়া ঐ ভাঁড়ামিগুলি হইয়া থাকিলেও ইহাও ঠিক যে, অনেক মেয়ে নিজে উহার সব দৃশ্যগুলিতে সমান মজা না পাইলেও,—কোন কোনটিতে বরং একটু ব্যথা লাগিলেও উদারতা ও বাহাদুরি দেখাইবার এবং অনুষ্ঠাতৃদের উৎসাহ দিবার জন্য হয়ত বেশী করিয়াই হাসিয়াছিলেন।

তারপর পাশ্চাত্যদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথাও মনে করিতে হয়। তাহারা ঐ রকম হাল্কা আমোদের স্রোতে সময় সময় আপনাদের ছাড়িয়া দিলেও পদ্ম পত্রের মত সবই ঝাড়িয়া ফেলিতেও জানে। এতদিন মেয়েরা একবার যাহা কিছু করিলেই সেই খানেই তাহাদের চাপিয়া রাখা হইত। শরীর মন উভয়তই সচলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া তাহারাও এখন সবই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে।

'নারী মানুষের হৃদয়রাজ্যের খনির মধ্যে নিতুই নব প্রেরণার আলো আবিষ্কার করার সুযোগ বেশী করে পায়' এই সুবিধাই কি তাহাকে এতদিন দেওয়া হইয়াছিল? অমন করিয়া খনির মধ্যে ডুবিয়া থাকার তাহার কিই বা প্রয়োজন। তাহা উচিতও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। 'গৃহাঙ্গনের

নিরালা উদ্যানটি'তে 'মুক্ত আলো হাওয়াই' বা কতটুকু থাকে? নারী যদি আজ খিড়কির আস্তাওড়ার জঙ্গল হইতে সদরের সজ্জিত ফুল বাগানটিতে পদার্পণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সমস্তই কি 'কুশ্রীতার আখড়া' বলা যায়? আমাদের ভাষা ও বেশভূষাই বা কোথায় বেশী সুশ্রী, সুমার্জ্জিত হইয়া থাকে? ঘরে না বাহিরে? পুরুষেরা বাহিরই দেখেন বলিয়া তাহার কুশ্রীতা জানেন, কিন্তু ঘরেই কি সব সুশ্রী, শোভন, শ্রমলেশশূন্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত? দৈনন্দিনের সমস্যা, হাঁকাহাঁকি ঘরেই কি কিছু কম আছে? তবে উপায়হীনভাবে নারীকে সেইখানেই ঠেসিয়া ধরা কেন? বাহিরের মুক্ত হাওয়া ও সৌন্দর্য্য উপভোগের সহিত তাহার কুশ্রীতা দূর ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও না হয় তাঁহারা কিছু ঘাড়ে লইলেন।

'স্নেহ প্রীতি-প্রেম'এর প্রয়োজনও কি কেবল ব্যক্তিগত ভাবে গৃহের মধ্যেই আছে? জগতের সর্ব্বত্রই তাহার প্রয়োজন খুব বেশী রকম নাই কি? আগের গৃহবদ্ধ নারীদের 'স্নেহ-প্রীতি-প্রেম'ই বা সাধারণত কতটা হিংসা, নিষ্ঠুরতা, সঙ্কীর্ণতা, অজ্ঞতার মূল্যে ক্রীত হইত? এখনকার মনস্বিনী নারীদের স্নেহ, প্রীতি, প্রেম কি তাহাপেক্ষা কম পরিস্ফুট? 'ক্রিয়াকর্ম্ম'ও কি কেবল ঘরেই আছে?

ব্যক্তিগত গৃহই কি একমাত্র গৃহ? রাষ্ট্র ও সমাজগৃহও কি গৃহ নয়? না মেয়েরা রাষ্ট্রসমাজের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেন না,—যে, তাঁহাদের সে সম্বন্ধে কোনই কাজ ও কর্ত্তব্য নাই? গৃহ এবং রাষ্ট্রসমাজও কি পরস্পর সম্বন্ধশূন্য ও বিরুদ্ধ? ব্যক্তিগত গৃহ বলিতেও শুধু অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত, সৎলোকের গৃহই বুঝায় না। গৃহ কুশ্রী, পঙ্কিল, অপমান ও যন্ত্রণাপূর্ণ হইলে তাহার মত কুশ্রী ও অসহ্য জিনিষ আর কিছুই নাই। সর্ব্বদেশে কোটী কোটী নারী যুগ যুগ ধরিয়া হাত, পা বাঁধা হইয়া সেই রকম গৃহের নরককুণ্ডে খাবি খাইয়া আসিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি আপনার শ্রমের ফলে অর্থ, বিদ্যা, সম্মান, প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতা লাভ করে,—এমন কি অনেক সময়ে হাল্কা খেলো আমোদেও যোগ দেয় তাহা কি খুবই দুঃখের বিষয়? খেলোমি বন্ধ করিবার উপায়ও কি নারীকেই চাবি দেওয়া? না,—সৎশিক্ষা, রুচিজ্ঞান ইত্যাদির দ্বারা সকলের মধ্য হইতেই যথাসম্ভব তাহা দূর করিবার চেষ্টা?

পাশ্চাত্যেও মেয়েদের যাহা কিছু দেখা যায়, সবই শুধু নব্যতন্ত্রী মেয়েদের মত ও ইচ্ছানুসারেই হয় না। আরও অনেক বিষয় অর্থাৎ দেশের অবস্থা, পুরুষের ইচ্ছা ইত্যাদিও তাহার মধ্যে কম কাজ করে না। তবে কেবল বিদেশীদের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকিতে হইলে অনেক জিনিষই আমাদের অবশ্য পীড়া দিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে যুগসভ্যতার উদয় হইতেছে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়কেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। বাহিরে বাজে জিনিষ যতই থাক, মূলতঃ উভয়ের সারসত্যের আলোকে তাহা প্রকাশিত হয় ইহাই দেখিবার বিষয়। তাহা না করিয়া প্রাচ্য যদি আপনার সংসারের অহঙ্কারেই সরিয়া থাকে, তাহা হইলে কিন্তু নবযুগে তাহার স্থান হইবে না।

আজকার কাগজের পৃষ্ঠাতেই বিলাতের বিদেশযাত্রী টেনিস্ খেলার দলের মেয়েদের স্বাস্থ্যোৎফুল্ল, সজীব, সহাস্য মুখের ছবি সম্মুখে রহিয়াছে। এই কাগজেই মেয়েদের এয়ারো-প্লেন প্রতিযোগিতারও একটি বিবরণ পাওয়া গেল। ইহা কি কেবল 'নারীর ক্রমেই পুরুষ হয়ে ওঠা?'—আমাদের দেশের তত্ত্ববিদ্যার পরাকাষ্ঠার সময় যদি গার্গী, মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পাশ্চাত্য শারীরসাধনা, বৈজ্ঞানিক সাধনা, সহস্র ক্ষেত্রে আপনার প্রাণশক্তিকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার বিচিত্র লীলার যুগে মেয়েদের এই বহুধা আনন্দ ও শক্তিপ্রকাশের প্রয়াসের মধ্যেও কি যুগসভ্যতার আভাস পাওয়া যাইতেছে না? যেগুলির সম্বন্ধে তর্ক ও বিরুদ্ধতা বেশী, দৃষ্টান্তগুলি সেইরূপ বিষয় হইতেই লওয়া হইল। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বহুখ্যাত অখ্যাত নারীমণ্ডলী নানাভাবে দেশহিত, জনহিতের শত শত অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের গঠন, পরিচালনে জীবন সমর্পণ করিতেছেন,—কতভাবে নারী ও শিশুর রক্ষা, পরিচর্য্যা ও মঙ্গলবিধান এবং পাপতাপের নিবারণ ও প্রতিকারে নিযুক্ত আছেন,—নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদানের জন্য অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যটনে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের কথাও ভাবিতে হয়। এখন সর্ব্ববিদ্যায়, সর্ব্ব-

কর্ম্মে সর্ব্বশ্রেণী ও সর্ব্বজাতিই প্রতিযোগী হইতেছে—তবে নারীর 'প্রতিযোগিতা'তেই বা এত বৈমুখ্য কেন? ইহাতে গুণের মূল্য ও মর্য্যাদাই বাড়িতেছে না কি? প্রতিযোগিতা না বলিয়া ইহাকে সহযোগিতাও বলা যায়।

'সংসারে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যে'র বিষয়ে মেয়েদেরই বেশী জানা থাকায় সে বিষয়ে চিন্তাও তাঁহাদের যথেষ্টই আছে। তবে ঐ সংসার বা গৃহের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন তাঁহারা চাহেন। আর সে বিষয়ে তাঁহাদের অনেক পরিকল্পনাই ঠিক আছে। পুরুষ যেমন তাহার কাজগুলি সঙ্ঘবদ্ধতা এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে নানারূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমলাঘব করিয়া বহুভাবে, বহু উপায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়াছে,—এতদিন যে কাজগুলি মেয়ের উপর আছে, সেগুলিকেও সেইভাবে গুছাইয়া লইতে এখন সে চাহিতেছে। এবং পুরুষ তাহার আদিম হলচালনাদিকে ঐরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যেমন এক-সঙ্গেই সেই কাজগুলির উন্নতি এবং আপনাদের মধ্যেও অনেকে তাহা হইতে অবসরলাভের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া আরও নানাবিষয়ে আপনার শক্তি, প্রকৃতির নিয়োগ করিতে পারিতেছে,—মেয়েও তাহার প্রতি সমর্পিত কাজ-গুলির সেইভাবে উন্নতির সহিত আপনাদের মধ্যে ঐরূপে অবসর সৃষ্টি করিতে চায়।—যাহাতে সেও ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নানাবিষয়েই আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারে। আর ঘর, সন্তান পুরুষেরও বলিয়া আবশ্যক মত তাহারও উহাতে সহায়তা করা সে উচিত মনে করে।

স্নেহ প্রেমের সম্পর্কের লোকের নিকট হইতে যে কাজ পাওয়া যায়, সেই কাজগুলিকেই স্নেহ, প্রেমের প্রতীক বলিয়া মনে হইলেও স্নেহ প্রেম তাহাতেই বদ্ধ নাই। পুরুষের বলিয়া পরিচিত কাজগুলিতে যেমন দক্ষতা ও শ্রমশক্তির উপরই কাজের সাফল্য নির্ভর করে, মেয়েদের বলিয়া পরিচিত কাজেও তাহাই আবশ্যক হয়। শুধু স্নেহ প্রেমেই তাহাতে সফলতা লাভ হয় না। স্নেহ, প্রেম ও গৃহ ও গৃহকর্ম্মই আঁকড়াইয়া না থাকিলে লোপ পায় না।

নারীকে না জানিলেই প্রত্যেক প্রচলিত প্রথা ও ভাবের মধ্যেই মাত্র যেন 'নারীত্ব' রহিয়াছে এবং তাহার একটু এদিক ওদিক হইলেই উহা লোপ পাইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা অত ঠুনকো জিনিষ নয়। নরত্ব, নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব একত্র গ্রথিত। তাহা কিছুতেই নর বা নারী হইতে লোপ পায় না। তবে মনুষ্যত্বের সারসত্য যে দেবত্ব তাহাই অবশ্য নরত্ব, নারীত্বেরও সারসত্য। তাহার কিছু বিশেষত্বপূর্ণ প্রকাশ নর বা নারীর মধ্যে হইতে পারে। কিন্তু আগে হইতে দেবত্ব, মনুষ্যত্বের কোন প্রকাশকে কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি অথবা কাহারও চারিত্র-সম্পদে তাহার কোনও কিছুকে ছোট করিয়া দেওয়াও যায় না। তাহা হইলে মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নরত্ব অথবা নারীত্বকেও খর্ব্ব করা হয়।

পুরুষ আপনার মনের কয়েকটি বিশেষ সম্ভাবকেই নারীর প্রতীক বলিয়া মনে করে কেন? নারী কি শুধু পুরুষের মনের কয়েকটি বিশেষ ভাবাবলী মাত্র? সেগুলিতে দেবত্বের সৌরভ ও রহস্য থাকিতে পারে—কিন্তু উহা যে তাহারই সনাতন মানব-মনের দেবত্বের আভাস। তাহাকে আপনার মনোমন্দিরে বিকাশ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অপরের কাছে খুঁজিতে যায় কেন? 'নারীর প্রকৃত রূপ' তার গভীর সত্য নিয়ে তাহার নিজের অপেক্ষাও পুরুষের কাছেই কি বেশী প্রতিভাত? নিজের অন্তরের দেবত্বের সৌরভ ও রহস্য সনাতন মানবমনের সত্য বলিয়াই পুরুষ তাহার সত্যতা অনুভব করে। কিন্তু 'নাভিকে সুগন্ধ মৃগনাভি জানত ঢুঁড়ত ব্যাকুল হই'—তবে নারীর অন্তরেও দেবত্বের সৌরভ ও রহস্য অবশ্যই আছে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি নারী পুরুষের কল্পনার কয়েকটি বিশেষ ভাবমাত্র হইতে পারে? তারপর নর-নারী উভয়েই উভয়ের সহযোগে মিলনে সম্পূর্ণ হইলেও পুরুষেরই প্রয়োজন বা বিশেষ ভাবের খোরাক যোগাইবার জন্যও অবশ্য নারীর সৃষ্টি নয়।

পুরুষ নিজের স্বরূপকে যে ভাবে দেখিয়া থাকে, সহস্র প্রকার বিপরীত গুণাবলীর সমষ্টি হইয়াও যেমন তাহার

ভিতরের দেবত্বে বিশ্বাস করে,—নারীকেও যদি সেই ভাবে দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই তাহার স্বরূপ কতকটা বুঝিতে পারে। নতুবা নারীর বিরাট মানবসত্বাকে অস্বীকার করিয়া কতকগুলি ভাবমাত্র রূপে তাহাকে ধরিয়া লইয়া ঠিক তাহার প্রতিরূপটিই সম্মুখে দেখিতে না পাইলেই ঘৃণা করিতে থাকার নাম কি নারীকে 'শ্রদ্ধার অঞ্জনে' দেখা?

যৌনসংস্কারক্রমে মেয়ের পুরুষের সম্বন্ধে এবং পুরুষের মেয়ের সম্বন্ধে এক রকম রাজপুত্র-পুত্রীর কল্পনাও অবশ্য থাকে। তাহাতে আপনার প্রেমিক-প্রেমিকাকে রূপগুণে আদর্শভাবে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। ইহার দাবী কতদূর অবধি মানিয়া লওয়া সঙ্গত? কারণ ইহার মধ্যে উভয়েরই সম্ভাবের প্রেরণা আছে। কিন্তু ইহার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে? সমগ্র নারীজাতিকেই বহুযুগ হইতে কেবল পুরুষের যৌনসংস্কার ও স্বার্থমূলক আদর্শের ছাঁচেই ঢালিয়া আসা হইতেছে। আর নারীর পুরুষের সম্বন্ধে সত্য আদর্শ আকাঙ্ক্ষা প্রায় চাপা পড়িয়া আছে। সমস্ত নারীজাতিকে যতই বলা হউক, মূলতঃ হিসাবেই দেখা হয় ও তাহাই করিয়া রাখিতে চেষ্টা হয়। অথচ এর অধিকার তাহার আপনার অল্পই আছে।

'অসুন্দর আবহাওয়া' কোথায় আর কখনই বা নাই? তবে 'বড় বিকাশের 'অনুকূল আলো-হাওয়া' বলিতে গেলে এখনই মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশী পাইতেছে। নারীর বড় বিকাশের সম্ভাবনা ত এতদিন একেবারেই রুদ্ধ ছিল। তাহার জন্যই ত তিনি প্রাণপণ করিতেছেন। তবে পুরুষের মত নারীরও বড় বিকাশের সহিত তাঁহাদের অনেকের মধ্যে খেলো ও হাল্কা জিনিষও ত দেখা যাইবেই। নূতন অবস্থায় তাহা নূতন ভাবে দেখা যাইতে পারে মাত্র। মাতা পৃথিবী যেমন ধূলা কাদা লইয়াও সুন্দর, মানুষকেও সেই ভাবেই দেখিতে হয়। নতুবা সৌখীন ভাবে কেবল সুন্দরের কল্পনার মধ্যে বড় বিকাশ নাই।

পুরুষের সবই শোভা পায় এবং মেয়ের যে সবতাতেই অশোভন ও অন্যায় হয়,—ইহার মধ্যেও কি সবই মেয়েকে কেবল বড় করিয়া দেখা? নারী হীন বলিয়াই সবই তাহার বেয়াদপি এই ভাবও ত কম নাই। অনেক বিষয়ে বলিতে গেলে সত্যই নারীকে বড় হইতে দিব না,—এদিকে সাধারণ মানুষ যত বড় নয়, মেয়েদের প্রত্যেকের কাছেই তত বড়ত্ব না পাইলে রক্ষা রাখিব না;—এই কি মেয়েকে 'বড় করে দেখা?' অসমভাবে এই ধরণের ভালত্বের দাবী প্রবলেরা সর্বত্রই অধীনস্থ দুর্ব্বলজনের উপর করিয়া আসিতেছে না কি? মেয়ের হওয়ার মুস্কিলেই এই সব রকম অন্যায় ও কুৎসিৎ কাঠামর উপর তাহার সম্বন্ধে সভ্যতার উদয়ে কেবল রং চড়িয়াই আসিয়াছে। কাজেই সেই কুৎসিত কাঠাম বাহির হইয়া পড়িলে এতই বীভৎস দেখায় যে, তাহাকে স্বীকার করাও মানুষ অপবিত্রতা মনে করে।

নর-নারীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট গুণকর্ম্মের দিকে দেখিতে গেলেই বা কি দেখা যায়?—পুরুষের গুণকর্ম্মে আপনারই বিশেষ শক্তির প্রকাশ ও সার্থকতা; এবং তাহা মানব সাধারণের জন্য। কিন্তু নারীর গুণকর্ম্মে প্রধানতঃ অপরের তৃপ্তি, আরাম, আনন্দ,—আত্মীয়দেরই শুধু উহা বিশেষ সুবিধাজনক আর তাঁহারাই মাত্র তাহার ফল ভোগ করেন। ইহাতে কি চোখে পড়ে? আত্মশক্তির পরিচয় দিবার, উদার পৃথিবীতে আপনাকে মেলিয়া ধরিবার আনন্দও যেমন পুরুষের ভাগে পড়িয়াছে; স্নেহ, প্রেম, পরিচর্য্যা পাইবার আরাম, সুখও তাহার জন্যই উন্মুক্ত আছে। নারীর এ দুয়ের কিছুতেই অধিকার নাই। আত্মোপলব্ধি, আত্মতৃপ্তির সম্ভাবনা তাহার অল্পই, আপনাকে বিলুপ্ত করাই তাহার কাছে দাবী। তারপর পুরুষই নারীর বিধাতার পদ গ্রহণ করিয়া আছে। এই বিভাগ কি খুবই ঠিক? খুবই নির্দ্দোষ?

আবার আশ্বিন ঘুরিয়া আসিল। মনে পড়ে সেই পথিক-বন্ধু কবে যে আমাদের গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আজও সে ফেরে নাই। সে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে কল্লোলের এত উন্নতি, এত সৌভাগ্য, সে কি ইহার কিছু খবর জানে? কল্লোলের উপর এই যে ঈর্ষা ও অপ্রেমের নিষ্ঠুর আঘাত পতিত হইতেছে তাহার সংবাদও কি সে জানে!

তাহার 'পথিক' উপন্যাসের পথিক-মুকুলের মত একদিন সেই যে সে অন্ধকার পথে বাহির হইয়া পড়িল আর তাহার দেখা পাই নাই। শরতের পথ বাহিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, আমাদের পথের বন্ধু গোকুল আর ফিরিল না। এই কথাই আজ বিরুদ্ধ সংগ্রামের দিনে বারে বারে মনে পড়ে।

সাহিত্যক্ষেত্রে গোকুলচন্দ্র নাগ প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে জানিত, কোনও প্রতিষ্ঠারই মূল্য নাই যদি তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। তাই সে কল্লোলকে জীবনের সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ের অনেকেই হয় ত তাহার রচনা পড়িবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহারা এই অল্পায়ু লেখকের প্রকাশিত লেখাগুলি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, মানুষ হিসাবে গোকুলচন্দ্র কত বড় ছিল।

এই মানুষটি বুঝিয়াছিল, লোকতুষ্টির জন্য যে সাহিত্য তাহার ভিতর আত্মপ্রতিষ্ঠার অনেকখানি প্রলোভন থাকে এবং সেই কারণে তাহাতে মানুষ তাহার চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও রসানুভূতির দ্বারা যাহা বুঝিতে পারে তাহা সবটুকু প্রকাশ করিতে পারে না। এই কথাটি তাহার মনকে পীড়িত করিয়াছিল বলিয়াই সে কল্লোলের প্রতিষ্ঠায় দেহের ও মনের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিল।

কল্লোলের আজকের এই সৌভাগ্যের অবস্থায় তাহার হাতের অনেকখানি স্পর্শই গোপনে রহিয়াছে। যাঁহারা কল্লোলের নূতন পাঠক তাঁহারা জানেন না, গোকুল কল্লোলের কত বড় সহায় ও শক্তি ছিল। সরল, একনিষ্ঠ সহকর্ম্মী বলিতে যাহা বুঝা যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ আমাদের তাহা অপেক্ষাও বেশী কিছু ছিল।

কিন্তু ভীষণ রোগের কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করা গেল না। বাঙলার তরুণ শিল্পী, আমাদের পরমাত্মীয় গোকুলচন্দ্র কল্লোলের তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ না হইতেই চলিয়া গেল।

আশ্বিনে তাহাকে হারাইয়াছি; বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে আজ তাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করিতেছি।

যাঁহাদের ধারণা আধুনিক সাহিত্য কিছুই হইতেছে না এবং তরুণ সাহিত্যিকেরা যাহা লিখিতেছেন তাহা অসুন্দর

ও অক্ষম রচনা তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য আমরা গত কয়েক সংখ্যায় তরুণের দিক হইতে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ যে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন তাহা অধিকতর অশ্লীল ভাষণে পরিপূর্ণ। ইহা দেখিয়া আর কিছুই বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ দেখা গেল, এরূপ জঘন্য রুচির লেখাও বাঙলার জনসাধারণ নীরবে সহ্য করিতেছেন, কেহই এরূপ আলোচনার কোনও রূপ প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হন্ নাই। আজকাল 'আধুনিক সাহিত্যের' সমালোচকবর্গের মধ্যেও নানা রুচির লোক দেখা যাইতেছে। কাহার রুচিকে দেশের লোকের রুচির স্বপক্ষ বলিয়া মনে করিব তাহা ঠিক্ বুঝা যায় না।

জনসাধারণ পুজা-পার্ব্বণে অনেক সং দেখে এবং সং-এর মুখে অনেক অবান্তর ও অশ্রাব্য উক্তিও শুনিয়া আমোদ-উপভোগ করে সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রেও যদি এরূপ সং দেওয়া ও সং দেখা প্রচলন হইয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্যের 'আভিজাত্য' ত দূরের কথা, ইজ্জতই থাকে না।

দেশের আধুনিক সাহিত্য বলিতে আমরা ইহাই বুঝি, বয়সে প্রাচীন বা তরুণ নর-নারী সাহিত্যের ক্রমপ্রবাহে যিনি যাহা কিছু দান করিয়াছেন তাহাই আজ আধুনিক সাহিত্যের পরিচয়। ইহাতে তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী-গণের কাহার কতটুকু অধিকার প্রাপ্য তাহা বিচার করিতে হইলে প্রত্যেক লেখক ও লেখিকার বয়স জানিয়া জাতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এবং লেখক বা লেখিকার বয়স কত হইলে তিনি আধুনিক সাহিত্যিকের অপবাদ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন তাহা বিচারকগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ভাল হয়। কারণ শুধু কল্লোলেই, বয়সে প্রবীণ অনেক লেখক-লেখিকা লিখিয়াছেন ও আজও লিখিতে-ছেন। খুব সম্ভব ইহাদের মনে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অশ্রদ্ধা নাই। এবং মাত্র সাহিত্যের উন্নতি ও নব নব বিকাশই তাঁহাদের সাহিত্য-চর্চ্চার কারণ।

তবুও আমরা মনে করি, তাঁহাদের এই অপবাদ হইতে রেহাই দেওয়া উচিত। বয়স কত পর্য্যন্ত হইলে লেখক বা লেখিকার লেখাতে যাহাই দোষ ত্রুটি থাকুক না কেন, তাহা আধুনিক সাহিত্যের কোঠায় পড়িবে না তাহা জানা আবশ্যক। তাহা হইলে তরুণ বা তরুণী যাহারা, তাহারা একরকম করিয়া এই সকল অপবাদ সহ্য করিবার মত ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে।

অনেক সমালোচকই হয় ত মনে রাখেন না, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বংশজ আজকের এই তরুণ-তরুণী। শ্রেষ্ঠ ও অগ্রজগণের আদর্শ ও রচনা হইতেই ইহাদের শিক্ষা। সে শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটি থাকিতে পারে, সাহিত্যচর্চ্চায় অক্ষমতা আসিতে পারে। ইহা কেহই অস্বীকার করে নাই।

কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা প্রমাণ হয় না যে, তরুণ লেখক বা লেখিকারা যাহা লিখিতেছে তাহা তাহাদের একান্ত কুশিক্ষার ফল।

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে বাঙলার তরুণ নর-নারী যতখানি শ্রদ্ধা করে এমন বোধ হয় অনেক সুবিধাবাদী প্রবীণ সাহিত্যিকও করেন না। স্বার্থের সংঘাতে যে সকল লোকের প্রাণের সরলতা মুছিয়া যায়, এমন অনেক লোক হয় ত স্থান ও কাল বিশেষে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও আনুগত্য প্রচার করেন। কিন্তু এমনও আমরা শুনিয়াছি, এরূপ ধরণের কোনও কোনও আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও আত্মাভিমানী সাহিত্যসেবী বলিয়া ফেলেন, আমার এই লেখাটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ওই লেখাটি লিখিয়াছিলেন। ধরিয়া লওয়া গেল, তাহাও সম্ভব! তাহা যদি সম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যায় এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনও রূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ যদি না পায়, তবে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে যদি কেহ সরলভাবে আলোচনা করে তাহা হইলে কি তাঁহাদের অপমান করা হইল বুঝা যায়?

একটা কথা এই স্থলে কাহাকে কাহাকেও জানাইয়া দেওয়া ভাল, খোসামোদ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে পার্থক্য

অনেকখানি। দেশের বহু তরুণ-তরুণী হয় ত রবীন্দ্রনাথ কিম্বা শরৎচন্দ্রকে চোখে দেখিবার সৌভাগ্যও লাভ করে নাই, কিন্তু ইঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া যে মানুষটিকে তাহারা অন্তরে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সম্মুখে গিয়া চাটুবাক্য বলা অপেক্ষা অনেক পবিত্র ও মূল্যবান্। এ কথা রবীন্দ্রনাথও জানেন, শরৎচন্দ্রও জানেন যে, তরুণ পুরুষ বা নারী হোক, তাহারা তাঁহাদের এত সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে যে, অনেক সময় তাহারা ইঁহাদের মত প্রতিভা ও গুণসম্পন্ন মানুষের কাছে উপস্থিত হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে। এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ইহাও জানেন, তরুণরাই তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, ইঁহাদেরই হাতে সব কিছু রাখিয়া যাইতে হইবে। তরুণ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে ভালই, নচেৎ আপনগুণে যতখানি রক্ষা পাইবার তাহা রক্ষা পাইবেই।

যাঁহারা খুব বড় হন্ তাঁহাদের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে বলিয়াই জানি। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন কে কি ভাবে ও কি কারণে কোন্ কথাটি বলে। এই ক্ষমতা-টুকু থাকে বলিয়াই তাঁহারা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন না বা নিন্দায় বিচলিত হন্ না, এবং চাটুবাদ ও মিথ্যা ব্যবহারকে তাঁহারা বাছিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাহা পারিলেও অনেক ক্ষেত্রে বিনয় ও ভদ্রতার খাতিরে মনীষি-গণ সে কথা কাহাকেও বুঝিতে দেন্ না।

আজ যদি দেশের জন্য বুকের রক্ত কেহ দিতে পারে তবে এই তরুণ-তরুণীই। আজও পর্য্যন্ত এই তরুণ ও তরুণীর বুকের রক্তের উপর দেশের কল্যাণ রথের চাকার চিহ্ন সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ শরৎচন্দ্রের বুকের রক্ত এখনও শুকাইয়া যায় নাই। আজকের তরুণ-তরুণী তাঁহাদেরই স্নেহের সন্তান। যদি আজ তরুণরা সাহিত্যের কোনও ক্ষতি করিয়া থাকে, স্নেহে প্রেমে ও সহানুভূতির আশ্রয়ে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা দিবার ভার ইঁহাদেরই উপর।

কিন্তু দুঃখ হয় এই কথা ভাবিয়া যে, কতগুলি লোক শ্রেষ্ঠগণের উদারতা ও সান্নিধ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের মতামতকে সুলভ ও বিকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র দেশের তরুণ সমাজকে কোনও কথা বলিতে চাহেন, আমাদের বিশ্বাস, সম্ভব হইলে দেশের সমস্ত তরুণ নর-নারী ইঁহাদের পদতলে বসিয়া তাহা শুনিতে প্রস্তুত। অনেক প্রবীনও হয় ত তাহাই করিবেন। তবে যাঁহারা নিজেদের ইঁহাদের সমকক্ষ বলিয়া নিজের মনের গোপন কোণে বিশ্বাস রাখেন তাঁহারা হয় ত যাইবেন না। এমন লোকও বাংলায় আছেন।

আমরা জানি, সাধারণ লোকের অতি সহজেই মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল ও মনীষাসম্পন্ন তাঁহাদের মতামত ধীর স্থির বিবেচনার ফল, তাই তাঁহাদের অভিমত সহজে বদ্লাইয়া যায় না।

আজকের এই নিন্দা গ্লানির দিনে আমরা শরৎচন্দ্রের মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে চাই। ইহাই শরৎচন্দ্রের তখনকার দিনের মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এবং আশা করি, এখনও শরৎচন্দ্রের একই মত, তাহা এত অল্প দিনে বদ্লাইয়া যায় নাই।

"—এমনই ত হয়; সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যি-কের এই ত সব চাইতে বড় সান্ত্বনা। সে জানে আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনা-গতের মধ্যে তারও দিন আছে; হোক সে শতবর্ষ পরে, কিন্তু সে দিনের ব্যাকুল ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে। * * * আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রাপথের সীমা আজও তেমনই সুদূরে।

* * * বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে,—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের দুঃখ, কত রকমের আশা—আকাঙ্ক্ষা,—থামবার যো নেই, চলতেই হবে,—শুধু কি তার নিজের

চলার উপরেই কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হ'তে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে!

* * * আজ যারা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাদের জর্জ্জরিত, তাদের আশা, তাদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথ রোধ করে থাকবে! তরুণ সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাদের চিন্তা, তাদের ভাব আজ অসঙ্গত, এমন কি অন্যায় বলেও ঠেক্‌তে পারে, কিন্তু তারা না বল্‌লে বল্‌বে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত কর্‌বে কে? * * * আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌছায় নি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্দ্ধনার আসন পাতা আছে। * * *

আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয় নি। এটা এসেছে হালে। * * * সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। নর-নারীর বহুদিনের পুঞ্জীভূত বহু মিথ্যা, বহু কু-সংস্কার, বহু-উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। * * * পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে; কিন্তু কোনও সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। * * * একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নাই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে—ফাঁকি। * * * সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়। * * * আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কেবল বাইরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ক্রটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই, এ কথা কোনও মতেই সত্য নয়। আজ একে হয় ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে কিন্তু এই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন। * * * তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজা-রাজড়া জমীদারের দুঃখ দৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"

এই সঙ্গে আরও কয়টি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি। কল্লোলের লেখা দেখিয়া যখন কেহ বিদ্রূপ বা ভৎসনা করিতে ইচ্ছা করেন তখন যেন একমাত্র কল্লোলকেই সেই জন্য অপরাধী করেন। কল্লোলের সহিত জড়াইয়া অন্য কোনও পত্রিকার নামোল্লেখ করা না হয়। কারণ কল্লোলের অপরাধের জন্য কল্লোল একলাই সমস্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

প্রত্যেক পত্রিকাই স্বতন্ত্র পত্রিকা, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। কল্লোল অন্য কোনও পত্রিকার সহিত পরামর্শ করিয়া চলে না, অন্য কোনও পত্রিকাকে সে তাহার নিজের আদর্শে চলিতে পরামর্শও দেয় না। অপরাধ তাহার একান্ত নিজের, সেই জন্য তিরস্কারও একান্ত তাহারই প্রাপ্য।

সংবর্দ্ধনার দিন যদি কোনও দিন তাহার ভাগ্যে আসে তবে সে দিন সে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের গৌরব বলিয়াই তাহা সকলের সঙ্গে গ্রহণ করিবে।

এই অনুরোধের কারণ, কল্লোলকে জড়াইয়া আর যেন কেহ অনর্থক সাহিত্যক্ষেত্রেও আর একটা জাতি বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি না করেন। তাহার সমস্ত কার্য্যের জন্য কল্লোল নিজে দায়ী এবং তাহার ক্রটি বা দোষের জন্য সমস্ত শাস্তি দুঃসহ হইলেও তাহা একা সহিবার শক্তি সে রাখে। কারণ সে জানে, অপরাধ অপেক্ষা শাস্তির গুরুত্ব চিরকালই বেশী হয়; এবং শাস্তি যাহারা দেয় তাহারাও অপরাধ করে।
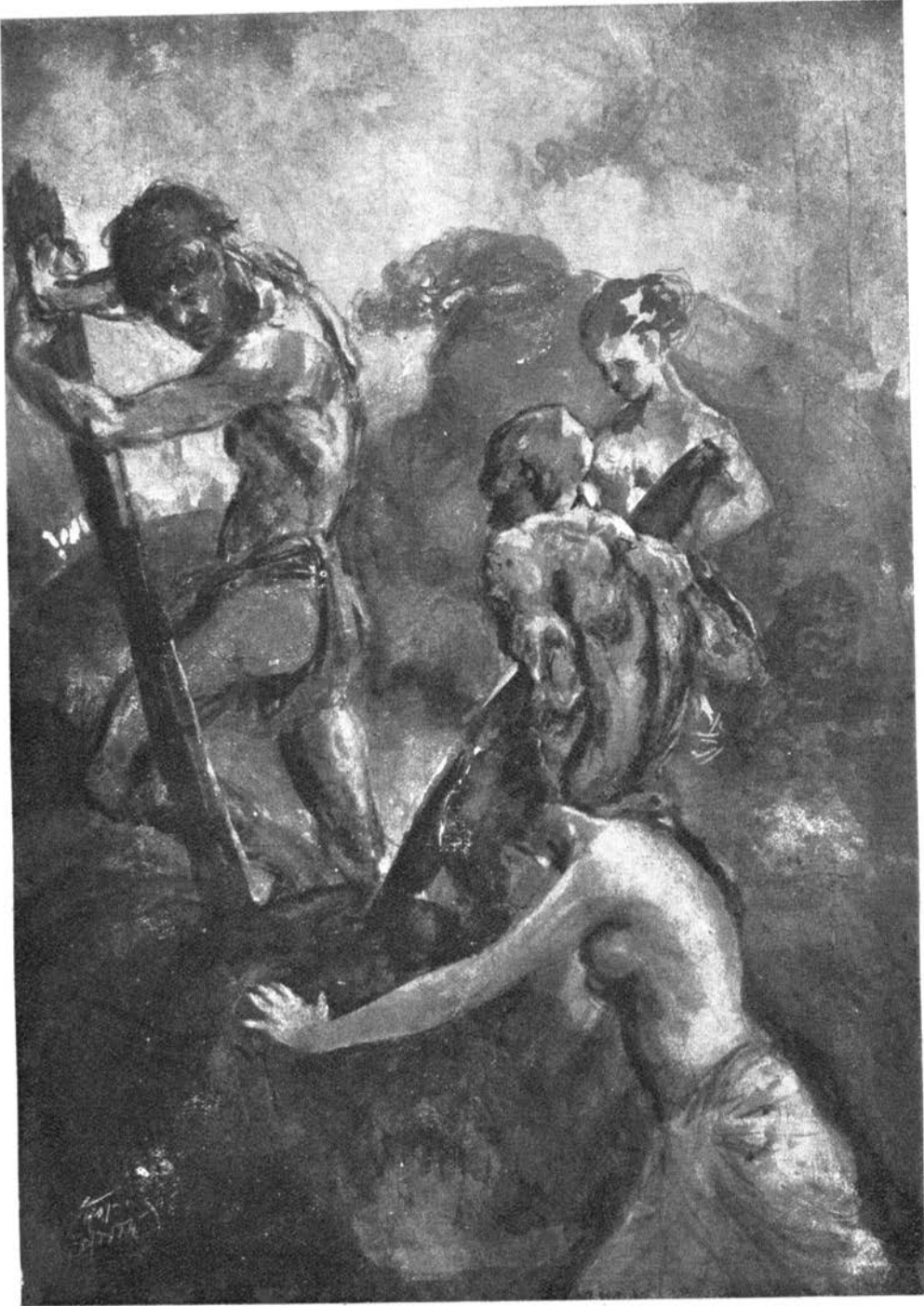
Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by K. Lahiri,
at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

শক্তি

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

কল্লোল

আসার আশায়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গোঁসাইপাড়ার গদির সেবায়েৎ নিরঞ্জন ভকত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর বয়স হয়েছিল, সংসারের ওপর মায়া-মমতা ছিল না বল্লেই হয়; কিন্তু তাই ব'লে গদির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার কিছুমাত্র কসুর ছিল না।

নূতন সেবায়েৎ নির্ব্বাচনের সময় হয়েছে, এ দিকে নিয়মের কাঠিন্যে সেবায়েৎ পাওয়া যায় না।

সে বড় কঠিন নিয়ম, সেবায়েতের জন্মের ইতিহাস কেউ জান্‌বে না; অনাথ, কুড়িয়ে-পাওয়া একদল মানুষের মধ্যে থেকে ভকতজিকে চোখে কাপড় বেঁধে বেছে নিতে হবে। সেই বাছাই-এর পর মাত্র এক বছর সময়। যদি এই সময়ের মধ্যে গদির সেবায়েৎ মারা গেল, তাহলেই সে গদি পাবে, নইলে তাকে চ'লে যেতে হবে। আবার নূতন নির্ব্বাচন।

এমন কতবার নির্ব্বাচন হয়েছে, কতবার বাছাই-মানুষটিকে বৎসরান্তে বিদায় নিতে হয়েছে।

শেষ মানুষটিকে নিয়ে নিরঞ্জনের কম বিপদ যায় নি। যতই বছরের মেয়াদ ফুরিয়ে আসে, ততই সে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! শেষে একদিন সে নিরঞ্জনের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে কাজ ফতে করার চেষ্টা করলে।

সে অনেক কথা! কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? হরির কৃপায় ম'রলো কুকুর বেরাল, বেঁচে গেলেন নিরঞ্জন ভকৎ।

তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত গদির যুবরাজ নির্ব্বাচনে নিরঞ্জনের আর কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু আর বুঝি সবুর সয় না।

গদির সেবায়েৎ নির্ব্বাচনের খবর বিদ্যুৎ গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো; এ দিকে ভকৎজির শরীর ক্রমেই অপটু হ'য়ে আসে!

লেংটি পরা রোগা, কালো কিম্ভূতকিমাকার চেহারার যুবকের দলে গদির নাট-মন্দির তো ভ'রে গেল। তাদের চেঁচামেচিতে আর কান পাতা যায় না!

কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, এদিকে প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের রাগ; যেন তার জন্যেই গদির সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হ'য়ে যাচ্ছে!

দূরে উঁচু মঞ্চের উপর একখানা খাট, সেই খাটের ওপর একটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে নিরঞ্জন সেই ভিড়ের প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর শ্যেন চক্ষু কি যে খুঁজে ফিরচে—তাও কেউ বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

গ্রামের পাঁচজন মোড়ল এসে ব'সে আছেন। সূর্য্য পাটে ব'সলেই নির্ব্বাচনের কাজ সুরু হয়ে যাবে। কাঁসর ঘণ্টা ঢাক ঢোল শাঁক নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে, কখন গোসাইজির হুকুম হবে।

এক এক লাইনে দশ দশ জন ক'রে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, বোধ করি সব সমেত পঞ্চাশ লাইন হবে।

সূর্য্যের আলো লম্বা শিশুগাছের মাথার ওপর থেকে মিলিয়ে যেতে না যেতে ভকৎজির ডান হাত উঁচু হ'য়ে উঠ্‌লো। সেই সঙ্গে শাঁক ঘণ্টা ঢাক ঢোলের শব্দে চতুর্দ্দিক কাঁপতে লাগ্‌লো!